অঙ্ক আতঙ্ক নয়



সিদ্ধার্থ ঘোষ

2

অঙ্ক আতঙ্ক নয়

সিদ্ধার্থ ঘোষ

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭৩

Anka Atanka Noi
by Sidhartha Ghosh
A book of popular mathematics
involving addition, subtraction,
multiplication and division.

চতুর্থ মুদ্রণ : জুলাই, ১৯৮৩
তৃতীয় সংস্করণ : মে, ১৯৭৯
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ :
আগস্ট ১৯৭৮ (প্রথম গ্রন্থপ্রকাশ সংস্করণ)

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও স্কেচ : অশোক সেনগুপ্ত

দাম : আট টাকা

কি ও কেন

অঙ্ক যে অনেকের কাছেই আতঙ্ক আর সেই আতঙ্ক কাটাবার জন্যে ইচ্ছাটাও যে বড় কম নয়, সেটা খুব ভালভাবে বোঝা গেছে 'অঙ্ক আতঙ্ক নয়' ও 'মজার খেলা অঙ্ক'-র ঝট্‌পট্ বিক্রি দেখে। ইতিমধ্যে বইয়ের লেখক হিসেবে অনেক ভাল ভাল কথা শুনেছি আর কিছু কিছু খারাপ। যারা ভাল বলেছেন তাঁদের সবিনয়ে জানাই—বই দুটোর মধ্যে আমার নিজের তৈরি করা কোনো অঙ্ক নেই। বহু বিদেশী বই ঘেঁটে আমি শুধু প্রয়োজন মতো বাছাই করে নিয়েছি। তবে, যাই গ্রহণ করে থাকি সেটা যদি বাঙালীদের মতো করে—পুরোপুরি সহজ বাঙলায় আত্মসাৎ করে থাকতে পারি সেটাই আমার সাফল্য। সব ভাষাতেই জনপ্রিয় অঙ্কের বহুরকম বই পাওয়া যায় অথচ বাঙলায় তেমন কিছুই নেই—এই কারণেই বোধহয় কাজটা শক্ত হলেও হাত দিতে সাহস পেয়েছিলাম। এবার আসি খারাপ দিকটায়। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন—এ বই কাদের জন্যে? খুব ছোট যারা, সবে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শিখছে বা শিখেছে তারা কি এ-বই পড়ে সবটা বুঝতে পারবে? ভাববার মতো প্রশ্ন। সত্যিই এ বইয়ের কিছু কিছু অংশে এমন অনেক নির্দেশ আছে যা বেশ খেয়াল করে পড়তে হয়। আসলে বইয়ের দামটা কম রাখবার জন্যে একের বেশী দুটো রঙ বা আরো বেশী ছবি ব্যবহার করার আমাদের কোনো উপায় নেই। সেই জন্যেই ইচ্ছে থাকলেও আরো সহজ করে বোঝাবার পথে বাধা এসেছে। আরেকটা কথা—এ ধরনের বই ছোটদের জন্যে লেখা হলেও, বড়রাও তার থেকে কম আনন্দ পাবেন না। জনপ্রিয় অঙ্কের ওপর এমন কোনো বিদেশী বই আমি দেখিনি যা শুধু শিশু ও কিশোরদের জন্যে

লেখা। বড়রা ও ছোটরা একসঙ্গেই এই বই নিয়ে বসতে পারেন। ব্যাপারটা সেই ঠাকুরমার ঝুলি পড়ে ছোটদের গল্প শোনানোর মতো আর কি! ছোটবেলায় ক'জন আর নিজে ঠাকুরমার ঝুলি পড়েছে!

'অঙ্ক আতঙ্ক নয়'-এ এবার আরো একটা পরিচ্ছেদ যোগ হয়েছে। 'সংখ্যাদের রকম সকম'। আশা করি সংখ্যাদের রকম-সকম দেখে সবাই শুধু মজাই পাবে না, সংখ্যা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার একটা অভ্যেসও তৈরি হয়ে যাবে।



সৌতি তার বাবাকে ক'দিন ধরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে। "ও বাবা—তুমি যে বলো লেখাপড়া ব্যাপারটা খুব মজার। এই বুঝি মজা ?"

যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সরলে বিরাট একটা লাল গোল্লা খেয়েছে ইস্কুলে, খাতাটা বাবার নাকের সামনে তুলে হনুমানের মতো ছটফট করছে। বাবা টেবিলে বসে এক মনে গল্প লিখছিল, ছেলের কাণ্ড দেখে সব মাথায় উঠল। "হ্যাঁরে—কালকে তো বাড়িতে বেশ পারছিলি অঙ্কগুলো। হঠাৎ এমন ভুল হল কেন ?"

"অত যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ একসঙ্গে আমি করতে পারি না। সব গুলিয়ে যায়। তাছাড়া এর মধ্যে মজাই বা কোথায় ?"

বাবা চশমা খুলে সৌতির দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। গল্প-সল্প লেখা অভ্যেস—ইতিহাসের পাঠ মুখস্ত করা নিয়ে সৌতির প্রবল আপত্তিটাকে মোটামুটি ম্যানেজ করা সম্ভব হয়েছিল। রাজায় রাজায় যত যুদ্ধের খুঁটিনাটির বিবরণ আর পিঁপড়ের সারির মতো সাল-তারিখের ভিড়ে মানুষের গায়ের রক্ত জল করে গড়ে

তোলা রোমাঞ্চকর ইতিহাসের কথা কেমন ভাবে চাপা পড়ে আছে, সেসব সৌতি জেনে ফেলেছে। এখন ইতিহাস পড়ার সময় ওর খালি নজর থাকে অলিখিত যত ভেতরের খবরগুলোর দিকে। শের শাহ তো ভারতের রাস্তাঘাট সুন্দর করে বানিয়েছিলেন, কিন্তু কারা সেই কারিগর যাদের কপালের ঘাম ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরেছিল! তারা কি খুব সুখে ছিল? এই রকম সব প্রশ্ন এখন তার মনে জাগে এবং বাবাও তার কৌতূহল কিছুটা মেটাতে পারে। তা বলে অঙ্ককেও যদি মজাদার ব্যাপার করে তুলতে হয়—দরকার নেই সৌতির লেখাপড়ায়! রাগ হয়ে যায়। "যাও যাও—নাচো গে যাও রাস্তায়, পড়াশোনা তোমার মোটেই হবে না। দু'টো যোগ বিয়োগ করতেই যার দম ছুটে যায়—"

সৌতির মা আশেপাশেই ছিল। বাপ-ছেলের কথাবার্তা কিছু কিছু কানেও এসেছে কিন্তু মাথা ঘামায়নি। রাগারাগির ব্যাপার ঘটেছে দেখে যথারীতি এবার হস্তক্ষেপ করতে হল। "এই দ্যাখো—আবার তোমরা ঝগড়া করছো তো! নে—চোখের জল মোছ্ আগে। আহা—বেচারা বুঝতে পারছে না অঙ্কটা আর তুমি—"

"ও—তুমিও ওর দলে। তা তো হবেই। এই করেই ছেলেটা গোল্লায় যাবে।"

"আমি তো ওর দলে থাকবোই। অঙ্কে কী কম রসগোল্লা খেয়েছি! তুমি ওকে ক'টা মজার অঙ্ক দাও না, তাহলেই ওর ভাল লাগবে। ও তো তাই চায়।"

"মজার অঙ্কের ছাই আমি কী জানি! মজার অঙ্ক বলে কিছু আছে কিনা তারই বা কী ঠিক!"

সৌতি মাকে জড়িয়ে ধরে দোল্ খায় এদিক-ওদিক। "আঃ—ছাড় না—"

"দেখলে তো, তুমি এতেই বিরক্ত হচ্ছ আর ও আমায় সকাল থেকে এই করে যাচ্ছে।"

"যাও—ওইটুকু ছেলের সঙ্গে আর ঝগড়া করে না। আমি তোমায় মজার অঙ্কের বই এনে দেবো যোগাড় করে।"

"কোত্থেকে আনবে?"

"দেখি, ন্যাশানাল লাইব্রেরি থেকে যা পাই নিয়ে আসব। মনে পড়ছে, ছোটবেলায় কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভারি মজা করে লিখেছিল, হাতে আমাদের দশটা করে আঙুল আছে বলেই সব গোনাগুন্তির ব্যাপারে দশের হিসেব চালু হয়েছে। এরকম গল্প নিশ্চয় আরো আছে।"

"হ্যাঁ মা—এই রকম মজার গল্প শোনাতে হবে।" সৌতি আনন্দের চোটে মায়ের কোলে ওঠবার জন্যে এমন ঝাঁপ কুড়ল যে মায়ের দেহের ভার কেন্দ্র ভীষণ ভাবে বিচলিত হল। নৌকোয় হঠাৎ লাফ্ মেরে উঠলে যেমন হয় আর কি! বাবার বিস্ফারিত নেত্র, মায়ের বিহ্বলতা, কোনটাই সৌতির নজরে পড়ল না। সে ঘোষণা করল, "জানো মা, কোন কাজ করতে না-পারলে বড্ড মন খারাপ হয়ে যায়। কেমন যেন লাগে। অঙ্ক না পেরে আমারও ভাল লাগছিল না, আর বাবারও মজার অঙ্ক মনে পড়ছিল না বলে অত রাগ হচ্ছিল। তাই না মা?"

সৌতির মা বাবা দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ। তারপরে খুব হেসে উঠল দু'জনেই।

"অত হাসছ কেন?" সৌতি বিজ্ঞের ভঙ্গীতে গম্ভীর মুখে জানতে চাইল।

মা আর বাবার হাসি আর থামে না। শেষে বাবা মুখ খুলল, "ঠিক আছে—কাল থেকে মজার অঙ্কের গল্প হবে। মা যখন বই এনে দেবে বলেছে, অসুবিধে হবে না।"

"তবে একটা কথা"—সৌতির মা তার বাবার লেখা কাগজপত্র সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "শুধু গল্প শুনবে আর ইস্কুলে পড়া—"

কথা শেষ করতে দেয় না সৌতি, "না মা না—স্কুলের পড়া ঠিক করবো। বাবার কাছে ইতিহাসের গল্প শুনি বলে কি ইতিহাস পড়ি না ?"

সৌতি এক দৌড়ে দরজা পেরিয়ে রাস্তায় চলে গেল। "এই বুবুল—এই বুবুল—" বন্ধুকে ডাকতে শুরু করেছে। পরক্ষণেই শোনা গেল সে তার বন্ধুকে বলছে, "জানিস, আজ আমার পড়ার ছুটি। কাল থেকে বাবার কাছে আগে গল্প শুনব তারপর অঙ্ক কষবো। জানিস তো, বাবা জানতোই না যে অঙ্ক নিয়েও গল্প হয়, ভাগ্যিস মা বলে দিল!"



নামতা ভুলে গেলে

বাবা সন্ধ্যেবেলায় সৌতিকে ডাকল। "আচ্ছা সৌতি—গুণ করতে যে এত ভুল করো, খুলে বল দেখি আসল অসুবিধেটা কোথায়?"

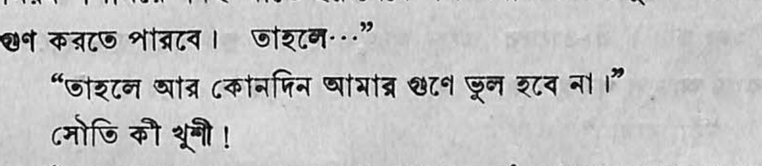
"জানো বাবা, নামতাগুলো মাঝে মাঝে ভুলে যাই। এক থেকে পাঁচ অবধি ঠিক মনে থাকে কিন্তু তারপরেই—"

"হুঁ। বুঝেছি। আচ্ছা তোমাকে যদি এমন একটা মজার নিয়ম শিখিয়ে দিই যাতে ছয় থেকে দশ অবধি নামতা ভুলে গেলেও গুণ করতে পারবে। তাহলে…"

"তাহলে আর কোনদিন আমার গুণে ভুল হবে না।"

সৌতি কী খুশী!

"বেশ, বেশ। মনো করো তোমার দু' হাতের কড়ে আঙুল দুটোর ওপর ছয় লেখা আছে আর তার ওপরের আঙুলগুলোর ওপর

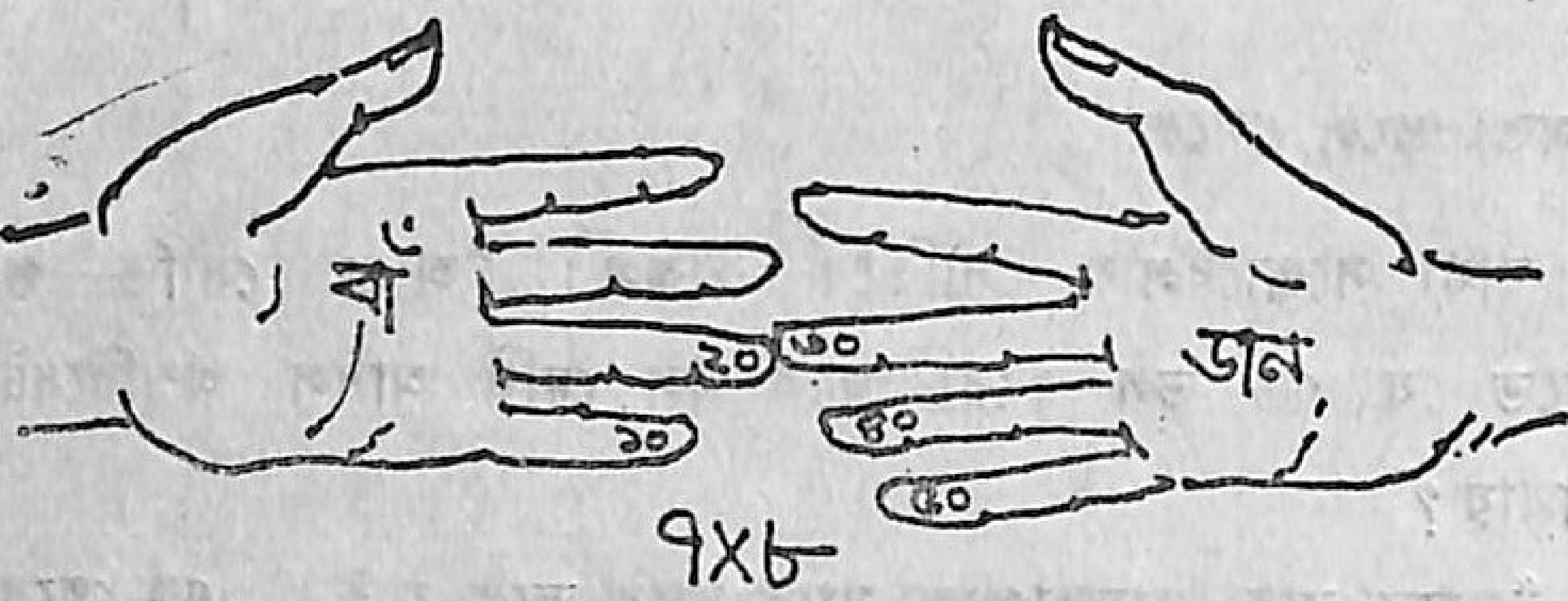


১নং ছবি

পর পর সাত, আট, নয় ও সবার শেষে বুড়ো আঙুল দু'টোর ওপর দশ লেখা আছে। এই যে, এই ছবিটা দেখো।" (১নং ছবি)

বাবা একটা ছবি এঁকে ফেলেছে।

"ধরো, তুমি সাতকে আট দিয়ে গুণ করবে। এক হাতের সাত লেখা আঙুলটাকে এবার আরেক হাতের আট লেখা আঙুলটার সঙ্গে ঠেকিয়ে ধরো। এবার দশ, কুড়ি, তিরিশ করে বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল থেকে গুনতে শুরু করো। যে-দুটো আঙুল ঠেকিয়েছ



২নং ছবি

সেখানে পৌঁছবার পর বাঁ-হাত থেকে ডান-হাতে চলে এসো, আর ওইভাবে গুনতে গুনতে নিচের দিকে নেমে যাও। এই ছবিটায় দ্যাখো (২নং ছবি) বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল থেকে শুরু করে ডান হাতের কড়ে আঙুল পর্যন্ত পঞ্চাশ গোনা গেছে। বুঝতে পেরেছো?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"বেশ। এবার গুনে বলতো, যে দুটো আঙুল ঠেকিয়েছ তার ওপরে বাঁ হাতের কটা আঙুল পড়ে আছে?"

সৌতি বলল, "তিনটে।"

"আর ডান হাতের কটা আঙুল পড়ে আছে?"

"দুটো।"

"তিন আর দুয়ে গুণ করলে কত হয়?"

"ছয়।"

"আগে তুমি দশ, কুড়ি, করে গুনে যে-সংখ্যাটা পেয়েছিলে তার সঙ্গে এই পড়ে-থাকা আঙুলগুলোর গুণফলটা যোগ করলেই সাতকে আট দিয়ে গুণ করার উত্তরটা পেয়ে যাবে।"

"পঞ্চাশ আর ছয়ে ছাপ্পান্ন। সাত আষ্টে—ছাপ্পান্ন।" সৌতি একেবারে অবাক।

বাবা বলল, "হ্যাঁ—সাত আষ্টে ছাপ্পান্ন। শুধু সাত আর আট কেন, ছয় থেকে দশ অবধি যে-কোন দুটো সংখ্যার গুণফল এইভাবে বার করা যায়।"

মা যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সৌতি খেয়ালই করেনি। মা বলে উঠল, "তোমার যেমন কাণ্ড, প্রথমেই ওকে গুণ শেখাচ্ছ। যোগ-বিয়োগ করতেই তো ভুল করে!"

বাবা বলল, "সে কী! সত্যি নাকি?"

আজকেই সৌতি একটা যোগে ভুল করেছে। মাথা নিচু করে বসে রইল।

মা বলল, "সবই বোঝে, শুধু অভ্যেস না করলে যা হয়।"

বাবা বলল, "যাও—আর মন খারাপ করে বসে থেকো না। কাল থেকে যোগ-বিয়োগের মজার মজার খেলা দেখাব।"



যোগ না-দিয়ে উপায় নেই

তখনো কাকেদের পর্যন্ত বোধহয় ঘুম ভাঙেনি। সৌতি বাবাকে ঠেলে তুলে দিল। রাত্তিরেই দেখেছে বাবা মা ইংরিজি বই নিয়ে বসে কি সব লিখছে। অঙ্কের গল্প ঠিক করছে বুঝেছিল সৌতি। তখন আর কিছু জিগ্যেস করেনি, বড্ড ঘুম পেয়ে গেছল।

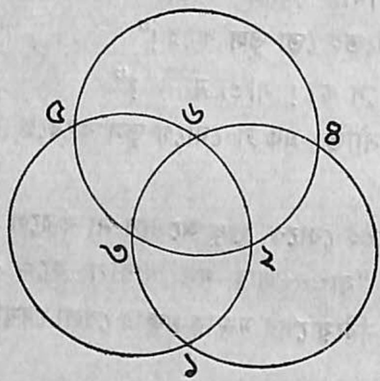
"বাবা, অঙ্কের গল্প বলবে তো?"

"ইয়েস্—ইয়েস্—আমি রেডি। তবে গল্প না-বলে খেলা বলাই

ভাল। এই নাও—” বাবা একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল সৌতির দিকে। (৩নং ছবি)

সৌতি দেখল বড় বড় তিনটে গোল্লা পাকানো রয়েছে আর গোল্লাগুলোর ধারে ধারে কতগুলো সখ্যা লেখা। কিছুই বুঝতে না-পেরে বাবার দিকে তাকাল।

“কি দেখছো কাগজটায়? কিছু মাথায় ঢুকছে না, এই তো?



৩নং ছবি

ওই যে চুড়ির মতো গোল গোল লাইনগুলো টানা হয়েছে, ওগুলোকে বলে বৃত্ত। কটা বৃত্ত রয়েছে ওখানে?”

সৌতি গুণে বলল, “তিনটে”।

“এবার যে-কোন একটা বৃত্ত বেছে নিয়ে তার ধারে ধারে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলো যোগ করতো দেখি।”

সৌতি যোগ করল—

৫+৩+২+৪=১৪

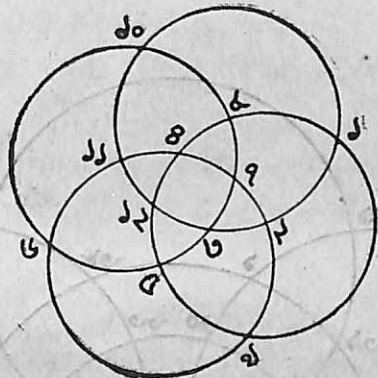
“যোগফল চোদ্দ হয়েছে তো? আচ্ছা, এবার আরেকটা বৃত্তের পাশের সংখ্যাগুলো যোগ করতো।

৬+৩+১+৪=১৪

"ওমা—এটাও যে চোদ্দ হল !"

"ওই তো মজা—যে-কোন বৃত্ত ধরে সংখ্যাগুলো যোগ দাও না, যোগফল সেই চোদ্দ। আচ্ছা—এবার আরো বেশি বৃত্তের একটা খেলা দেখাই। এই নাও—"

বাবা সৌতির হাতে আরেকটা কাগজ দিল। (৪নং ছবি) এটাতেও আগের মতো কতকগুলো বৃত্ত রয়েছে। তবে সংখ্যায় বেশি।



৪নং ছবি

"এবারো আগের মতো যে-কোন একটা বৃত্ত বেছে ধারের সংখ্যাগুলো যোগ দাও।"

সৌতি যোগ দিল—

১০ + ১১ + ১২ + ৩ + ২ + ১ = ৩৯

"উনচল্লিশ হয়েছে। আরেকটা বৃত্ত ধরে দেখব, মেলে কিনা ?"

"মিলবেই মিলবে—ওইটাই তো খেলা। করে দেখো।"

সৌতি যোগ ছিল—

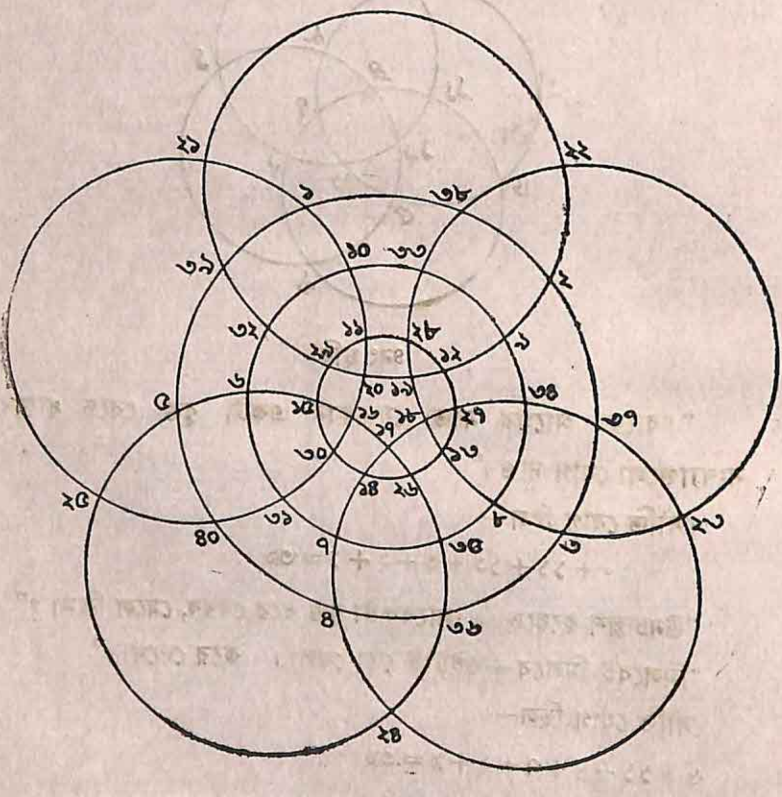
৬ + ১১ + ৪ + ৭ + ২ + ৯ = ৩৯

"দারুণ ব্যাপার তো—" সৌতি একের পর এক বৃত্ত ধরে যোগ করে আর দেখে যোগফল সেই উনচল্লিশ।

বাবা বললে, "এতেই অবাক হচ্ছ! তাহলে এটা দেখলে কি বলবে?"

"কই? দেখি—" সৌতি একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

"ওরে বাবা—কত বৃত্ত, আর কত সংখ্যা! (৫নং ছবি) এতেও ওই রকম যোগফল একই হবে প্রত্যেকবার?" সৌতির বিস্ময় আর বাগ মানে না।



৫নং ছবি

"নিজেই যোগ দিয়ে দেখো না!" বাবা মিটিমিটি হাসে।

সৌতি পরীক্ষা করে দেখতে প্রথমে সবচেয়ে ভেতরের বৃত্তটা বেছে নিয়ে যোগ দেয়—

২৮ + ১২ + ২৭ + ১৩ + ২৬ + ১৪ + ৩০ + ১৫ + ২৯ + ১১ = ২০৫

তারপর ঠিক তার পরের বৃত্তটা বেছে নেয়। যোগ দেয়—

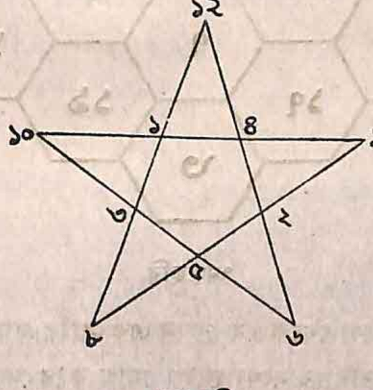
১০ + ৩৩ + ৯ + ৩৪ + ৮ + ৩৫ + ৭ + ৩১ + ৬ + ৩২ = ২০৫

এর পরেও চক্ষুস্থির না হয়ে উপায় আছে! সৌতি প্রায় মুগ্ধ। একের পর এক যোগ করে যায় আর দেখা যোগফল সেই তু'শ পাঁচ। সৌতি কোনদিন এত যোগ করেনি!

বাবা একটু পরে বলল, "ঠিক এমনি মজার খেলা বৃত্ত ছাড়াও হয়। দেখবে?"

সে আর বলতে! সৌতি তো তাই চায়। টেবিলের ওপর ঝুঁকে দেখলে বাবা একটা তারার মতো এঁকে তার ধারে ধারে সংখ্যা বসাচ্ছে।

"এই যে ছবিটা (৬ নম্বর) দেখছো—এর যে-কোন একটা লাইন ঠিক করে, তার ধারে যে-সংখ্যাগুলো আছে যোগ দাও। যে-লাইনই ধরো না, যোগফল একই হবে।"



৬নং ছবি

সৌতি প্রথমে যোগ দিল—

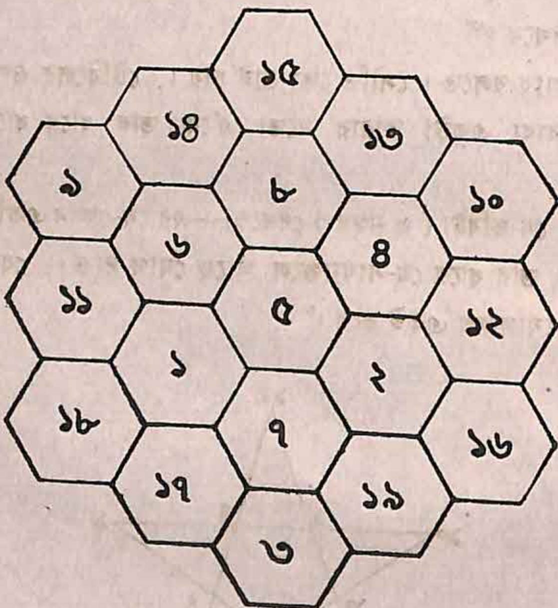
১০+১+৪+৯=২৪

তারপর অন্য একটা লাইন ধরে ফের যোগ দিল—

১২+১+৩+৮=২৪

"মিলছে তো?" বাবার প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় নেই সৌতির সব ক'টা লাইন এক এক করে ধরে যোগ দিয়ে তবে মুখ তুলল।

"আজকের শেষ খেলা এইটা।" বাবা মৌমাছির চাকের মতো ছোট ছোট কতকগুলো ছ' কোণা ঘরওলা একটা ছবি বাড়িয়ে দিল। প্রত্যেকটা ঘরের ভেতরে সংখ্যা বসানো! (৭নং ছবি)



৭নং ছবি

"এই ছবির মধ্যে থেকে যে-কোন এক সারি গায়ে গায়ে লাগানো ঘর বেছে নাও। তারপর সংখ্যাগুলো যোগ করে দেখো তো কি হয়!"

"এবারেও যোগফল এক হবে?"

"দেখোই না!"

সৌতি প্রথমে বাঁ-দিকের লম্বালম্বি সারিটা বেছে যোগ দিল—

৯ + ১১ + ১৮ = ৩৮

তারপর বেছে নিল কোণাকুণি একটা সারি—

১৮ + ১ + ৫ + ৪ + ১০ = ৩৮

সত্যিই এ ভারি মজার ব্যাপার। যোগ দিতে কারুরই ভাল লাগে না। কিন্তু এরকম মজার খেলা পেলে যোগ না দিয়েও যে উপায় নেই।



দুধ নিয়ে বিভ্রাট

সৌতির বাবার হরিণঘাটার দুধ পছন্দ নয়। রোজ সকালে নিজে দাঁড়িয়ে দুধ দুইয়ে নিয়ে আসে। মা বলে, যত বাতিক। সবই সমান। তবে সকালে ওঠাটা হয়, এই যা! নইলে তো কুম্ভকর্ণের ঘুম। সকালবেলা বাবা দুধের বোতল নিয়ে বেরোতে যাবে এমন সময় পাশের বাড়ির মণ্টুর বাবা এসে হাজির। "কি ব্যাপার? এত সকালে?"

"আর বলবেন না। বাড়িতে আজ কয়েকজন লোক খাবে। রোজ তিন লিটার দুধে হয়ে যায়। আজ চার লিটার লাগবে। ওদিকে আমার দুধের বোতলটায় মাত্র তিন লিটার দুধ ধরে। আর কোনো ধোওয়া বাসনও নেই যে তাতে দুধ আনবো। আপনার একটা বড় বোতল আছে না পাঁচ লিটারের?"

সৌতির বাবা বললে, "হ্যাঁ, একটা পাঁচ লিটারের আছে আর একটা আট লিটারের। তা একটা কাজ করুন না, আমারও আজ চার লিটার তুধ লাগবে; আপনি বরং আট লিটারের বোতলটাই নিয়ে যান। আপনার সঙ্গে আমারটাও নিয়ে চলে আসবেন।"

"বেশ তো—তাই দিন।"

ভদ্রলোক আট লিটারের বোতলটা নিয়ে চলে গেলেন। সৌতির মা চা করছিল। ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে ঘরে এসে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলতো—ওজন বা মাপ না করে, শুধু ওই তিন, পাঁচ আর আট লিটারের বোতল তিনটে দিয়ে আট লিটার তুধকে কি করে সমানভাবে তু' ভাগ করবে?" মুচকি মুচকি হাসে সৌতির মা। "সৌতি! এই সৌতি! এদিকে আয়!"

"কি হয়েছে মা?"

"তোর বাবাকে একটা অঙ্ক দিয়েছি। চেষ্টা করে দেখ্ পারিস কিনা। তু'জনেই তো খুব পণ্ডিত!"

বাবা বলে উঠল, "সর্বনাশ করেছে। এই সাত সকালে অঙ্ক নিয়ে পড়লে। বুঝলে সৌতি, তোমার মাকেও অঙ্কের খেলায় পেয়েছে!"

"ওসব এড়িয়ে যাওয়ার কায়দা আমি জানি। আসল কথার উত্তর দাও।"

ভদ্রলোক তুধ নিয়ে ফিরতে, সৌতি আর তার বাবা খুব চালাচালি শুরু করে দিল তিনটে বোতল নিয়ে। কিন্তু কিছুতেই আর সমান ভাগ হয় না। শেষে হাল ছেড়ে মায়েরই শরণাপন্ন হতে হল, "নাঃ—হচ্ছে না। দেখিয়ে দাও এবার—"

মা বললে, "পারলে না তো? তার মানে যোগ-বিয়োগটা ভাল রপ্ত হয়নি এখনো। এই দেখো—"

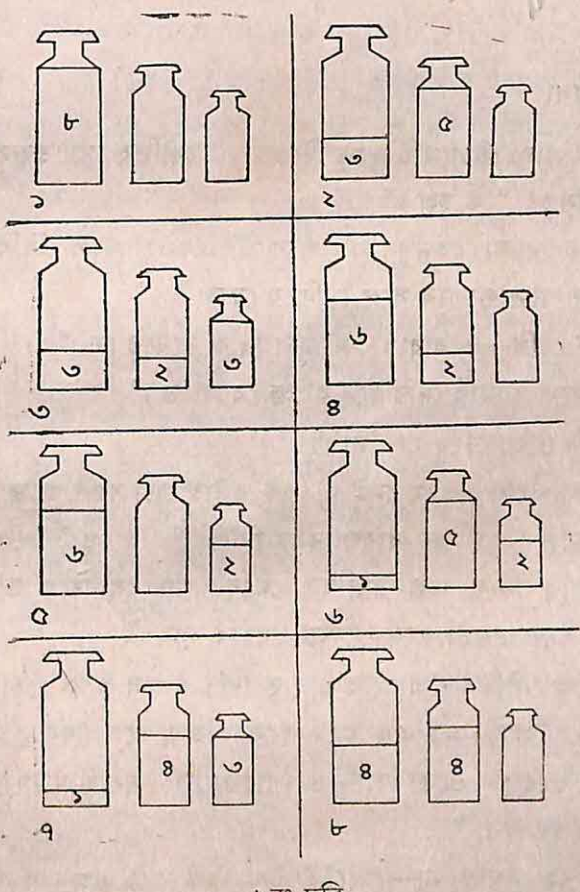
তিনটে বোতল নিয়ে সাতবার চালাচালি করেই মা আট লিটার তুধকে সমান তু' ভাগ করে ফেলল। "দেখলে তো!"

সৌতির বাবা বলল, "খুব হয়েছে—বই দেখে তো শিখেছ!"

"বারে—বই না দেখে শিখব কি করে।"

সৌতি ওদিকে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। "ও মা—ভাল করে আর একবার দেখিয়ে দাও না কি করলে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে—"

সৌতির মা কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে গেল। "এই আমি পর পর এঁকে দিচ্ছি—দেখলেই বুঝতে পারবি।" (৮নং ছবি)



৮নং ছবি



অচল পয়সা

হঠাৎ বাবা চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। সৌতির মা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। "কি হল ?"

"আর বলো কেন! বাঁ পকেটে একটা অচল সিকি ছিল। সেটা অন্য পয়সাগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছি।"

"কই দেখি—ও বাবা! ন' নটা সিকি রয়েছে যে!"

"ওদিকে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বেরোতে।"

"সিকিগুলো রেখে যাও না।"

"টাকা পয়সা একদম নেই। ওই কটাই তো সম্বল আজকে।"

"দাঁড়াও—দাঁড়াও—ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" মা ছুটে চলে গেল। দাঁড়িপাল্লাটা নিয়ে এল রান্নাঘর থেকে আর সৌতিকে ডাক দিল, "সৌতি—এও একটা অঙ্কের খেলা, দেখবি আয়।"

ওদিকে সৌতির বাবা মাথায় হাত দিয়ে ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়েছে। "হল—এক এক করে পয়সা ওজন করে এখন তুমি অচল পয়সা খুঁজবে? ওতো আমিও পারতাম। সবাই জানে অচল পয়সার ওজন কম।"

"না হে মশায় না—মোটেই এক এক করে ওজন করবো না। মাত্র দু'বার ওজন করেই অচল পয়সা বার করে দেবো।"

"কী মজা!" সৌতি লাফিয়ে উঠল।

মা ন'টা সিকিকে তিন ভাগ করল। তারপর এ-পাল্লায় তিনটে তুলে দিল আর ও-পাল্লায় তিনটে। দেখা গেল ওজন সমান। মা বলল, "তার মানে এই ছ'টার মধ্যে অচলটা নেই।"

সিকি ছ'টা নামিয়ে রেখে মা বাকি তিনটে সিকির মধ্যে দু'টো তুলে, এ-পাল্লায় একটা আর ও-পাল্লায় আরেকটা রাখল। এবার ওজন সমান। মা বলল, "তার মানে শেষ যে-সিকিটা পড়ে রয়েছে, ওজন করা হয়নি, ওইটাই অচল।"

সৌতি কিন্তু অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সে প্রায় উকিলি জেরা শুরু করে দিল। "আচ্ছা মা, এমন যদি হত যে প্রথমবার ওজন করার সময়ে, অচল সিকিটা ওই ছ'টা সিকির মধ্যেই থাকতো?"

"তাহলে যে-কোন একটা পাল্লা হাল্‌কা হয়ে ওপরে উঠে যেত। বোঝা যেত হালকা-পাল্লার সিকি তিনটের মধ্যে একটা অচল। তখন ওই তিনটের মধ্যে যে-কোন দুটোকে এক-এক পাল্লায় নিয়ে ওজন করতাম। যদি দেখতাম একটা পাল্লা হাল্‌কা, তাহলে অচল সিকিটা তখনই বেরিয়ে পড়ত, আর যদি দু'পাল্লার ওজন সমান হত, তাহলে বোঝা যেত ওজন না-করা সিকিটাই অচল।"

"হুঁ—তার মানে দু'বার ওজন করলেই অচলটা ঠিক বেরিয়ে পড়বে।" সৌতি আর তার বাবা মায়ের কীর্তি দেখে অবাক হয়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।



চালের ওজন

"মা—চাল লাগবে ?" চালওলার হাঁক শোনা গেল।

রেশনের চালে কুলোয় না। কিছু চাল কিনতেই হয়। মা সৌতিকে বলল, "যাও, দরজা খুলে দাও। চাল কিনতে হবে।"

চালওলাকে দশ কেজি চাল দিতে বললে সৌতির মা। কিন্তু কী কাণ্ড! কোথায় বাটখারা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করবে, না, কৌটো করে চাল মাপবার উপক্রম করেছে চালওলা। সৌতি ছুটে এল মায়ের কাছে। মা বলল, "যাও না, বাবা তো এই সেদিন নতুন বাটখারা আর দাঁড়িপাল্লা কিনে এনেছে। তাতেই মেপে নাও।"

সৌতি দাঁড়িপাল্লাটা পায়, কিন্তু দশ কেজির বাটখারা আর খুঁজে পায় না। দ্যাখে শুধু পাঁচটা বাটখারা রয়েছে—১, ২, ৪, ৮ আর ১৬ কেজি'র।

"মা—ও মা—বাবার কাণ্ড দেখো। মাত্র পাঁচটা বাটখারা কিনেছে।"

মা বলল, "ওই দিয়েই কাজ হয়ে যাবে। একত্রিশ কেজি অবধি সব ওজন ওইতেই হবে।"

"কিন্তু সে তো অনেকবার করে মাপতে হবে!"

"উঁহুঁ—একবারেই মাপা যাবে।"

"তাই নাকি!" সৌতি বেশ অবাক হয়ে গেল। চালওলা যে

ওদিকে বসে আছে খেয়ালই নেই। মিলিয়ে দেখছে মায়ের কথা ফলছে কিনা—

১+২=৩, ৪+১=৫, ৪+২=৬, ৪+২+১=৭, ৮+১=৯, ৮+২=১০, ৮+২+১=১১, ...১+২+৪+৮+১৬=৩১।

সৌতি শুধু ১, ২, ৪, ৮ ও ১৬-কে একবার এটা একবার ওটা করে যোগ দিতেই একে একে ১ থেকে ৩১ অবধি প্রত্যেকটা সংখ্যা পেয়ে গেল। "সত্যি মা, বাবা বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে বাটখারাগুলো কিনেছে।"

মা বলল, "আমি হলে কিন্তু চারটে মাত্র বাটখারা কিনতাম। আর তাই দিয়েই এক থেকে চল্লিশ অবধি সব মেপে দিতাম।"

"কি রকম?"

"১, ৩, ৯ আর ২৭ কেজির বাটখারা কিনলেই হত।"

"না মা, তা হবে না। দু'কেজি মাপবে কি করে বলো তো?"

"একটা পাল্লায় তিন কেজির বাটখারা চাপাব আর আরেকটায় এক কেজির। তাহলেই দু'টোর বিয়োগফল দাঁড়াবে ২ কেজি—মানে এক কেজির বাটখারা-চাপানো পাল্লাটাতে চাল ঢেলে পাল্লা দু'টো মেলালেই দু'কেজির সমান চাল মাপা হয়ে যাবে।"

"পাঁচ কেজি মাপবে কি করে?"

"এক পাল্লায় ন'কেজির বাটখারা থাকবে আর অন্য পাল্লায় এক কেজি আর তিন কেজি'র বাটখারা দু'টো চাপিয়ে তার ওপর চাল ঢালতে হবে। বাটখারা চারটেকে এ-পাল্লা ও-পাল্লা করে চল্লিশ কেজি পর্যন্ত যে-কোন ওজন মাপা যায়। যোগ-বিয়োগের ব্যাপার আর কী।"

সৌতি সঙ্গে সঙ্গে যোগ-বিয়োগের খেলায় মেতে উঠল। চালওলার কথা বেমালুম বিস্মরণ! পণ্ডিত ছেলে হলে এই বিপদ। মাকেই গিয়ে চাল মেপে নিয়ে আসতে হল।



অঙ্কের জাদুঘর

"আজকে জাদুঘরের খেলা দেখাব।" বাবা বলল।

পেন্সিল দিয়ে বাবা বেশ বড় করে একটা চৌকো ঘর আঁকল। তারপর পাশের দিকে সেটাকে পাঁচ ভাগ করল, নিচের দিকেও পাঁচ ভাগ করল। ছোট ছোট চৌকো ঘর তৈরি হল পঁচিশটা। কতকগুলো এলোমেলো সংখ্যা লিখে ঘরগুলো ভাত করে ফেলেছে এবার। (৯নং ছবি)

১৯	৮	১১	২৫	৭
১২	১	৪	১৮	০
১৬	৫	৮	২২	৪
২১	১০	১৩	২৭	৯
১৪	৩	৬	২০	২

৯নং ছবি

"এই নাও"—কাগজটা সৌতির হাতে তুলে দিয়ে বাবা বলল, "যে-কোন একটা সংখ্যা এর মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে তার চারপাশে গোল করে একটা দাগ দিয়ে দাও। আমাকে না-দেখিয়েই করো।"

সৌতি ২১-সংখ্যাটার চারপাশে একটা গোল দাগ টেনে বলল, "হয়েছে।"

"এবার ওই সংখ্যাটা যে-দু'টো সারির মধ্যে রয়েছে, মানে লম্বা-লম্বি একটা সারি আর তার পাশাপাশি আরেকটা সারির সব সংখ্যাগুলোই দাগ টেনে কেটে দাও।"

সৌতি লম্বালম্বি সারির ১৯, ১২, ১৬ ও ১৪ আর পাশাপাশি সারির ১০, ১৩, ২৭ ও ৯ কেটে বাদ দিয়ে দিল।

বাবা বলল, "এবার যে-সংখ্যাগুলো কাটা যায়নি তার মধ্য থেকে যে-কোনো একটা আবার ধরো। এবারো আগের মতো সংখ্যাটা যে দু'টো সারির মধ্যে রয়েছে, সেই দুটো সারিকে কেটে বাদ দাও।"

সৌতি ৩ ধ'রে তার চারপাশে গোল দাগ দিয়ে তারপর লম্বালম্বি সারির ৮, ১, ৫ ও ১০ আর পাশাপাশি সারির ১৪, ৬, ২০ ও ২ কেটে বাদ দিয়ে জানাল, হয়ে গেছে।

"ঠিক আগের মতো, এক একটা করে সংখ্যা বাছো আর দু'টো করে সারি কেটে বাদ দাও। এই ভাবে চারটে সংখ্যা বাছার পর দেখবে, একটা শুধু সংখ্যা পড়ে আছে। তখন আমায় বলবে।"

সৌতি এবার বাছল, ২২, তারপরে ৪। ৭টা শেষ পর্যন্ত পড়ে রইল। বাকী সংখ্যাগুলো কাটা গেছে। "হয়ে গেছে বাবা—"

বাবা বলল, "যে-সংখ্যাটা শেষ অবধি পড়ে রইল, সেইটার সঙ্গে বাছাই-করা সংখ্যাগুলো, মানে গোল দাগ-দেওয়া সংখ্যাগুলোকে যোগ দাও দেখি।"

সৌতি যোগ দিল—৭+২১+৩+২২+৪=৫৭

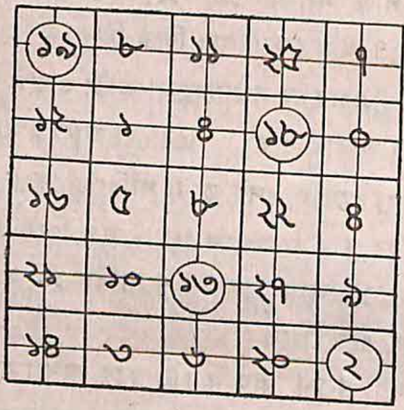
বাবা বলল, "তোর যোগফল কত হয়েছে বলে দিতে পারি।"

"বলতো দেখি।"

"সাতান্ন।"

"কি করে বললে? আমি যদি এই সংখ্যাগুলো না-বেছে অন্য সংখ্যা বাছতাম?"

"যে সংখ্যাই বাছো না, যোগফল সব সময় সাতান্ন হবে।"
সৌতি অবাক হয়ে, নতুন করে আবার সংখ্যা বাছল। (১০নং ছবি)
২ + ১৩ + ১৯ + ১৮ + ৫ = ৫৭।
যোগফল সেই সাতান্ন!



১০নং ছবি

সৌতির অবাক হওয়া লক্ষ্য করে বাবা বলল, "দাঁড়াও—তোমাকে এই রকম সংখ্যার জাদুঘর তৈরি করার একটা কায়দা শিখিয়ে দিচ্ছি। ধরো, তুমি এমন একটা জাদুঘর বানাতে চাও যার যোগফল হবে পঁচিশ, আর যাদুঘরের পাশাপাশি বা লম্বালম্বি সারিগুলোতে চারটে করে চৌকো চৌকো ঘর বা চৌখুপী থাকবে। এবার তোমার প্রথম কাজ হবে এমন আটটা সংখ্যা বেছে নেওয়া, যার যোগফল পঁচিশ। এখন যদি জাদুঘরের প্রতি সারিতে চারটের বদলে পাঁচটা করে চৌখুপী থাকে তাহলে আটটা সংখ্যা না নিয়ে এমন দশটা সংখ্যা বেছে নিতে হবে, যাদের যোগফল পঁচিশ। বুঝেছ?"

সৌতি বলল, "হ্যাঁ বাবা। আমি তাহলে আটটা সংখ্যা বলি একে একে। প্রথমে সাত, তারপর আট—যাঃ, দু'টোয় মিলেই

তো পনেরো হয়ে গেল। ঠিক আছে, এবার বলছি, এক, দুই আর তিন। ক'টা সংখ্যা হল বাবা ?"

"পাঁচটা হয়েছে, আর এই পাঁচটার যোগফল হয়েছে একুশ। তার মানে আরো তিনটে সংখ্যা বলতে হবে যাদের যোগফল হবে চার।"

সৌতি বলল, "এক, দুই আর এক। এবার হয়েছে তো ?"

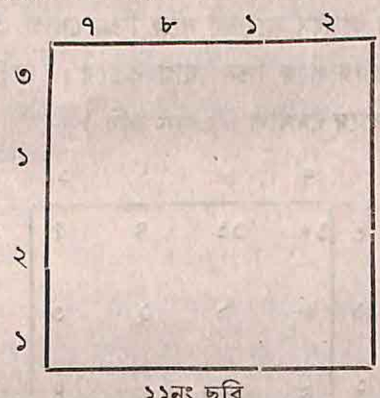
বাবা বলল, "লিখে মিলিয়ে নেওয়াই ভাল।"

সৌতি লিখল—৭+৮+১+২+৩+১+২+১=২৫

"আটটা সংখ্যাও হয়েছে আর যোগফলও পঁচিশ হয়েছে।"

"বেশ—এবার আগের মতোই চৌকো একটা ঘরকে পাশাপাশি চারভাগ আর লম্বালম্বি চারভাগ করে লাইন টেনে ষোলটা চৌখুপী বানিয়ে দাও। বড় চৌকো ঘরটার মাথায় এক-একটা চৌখুপী বেছে ওই আটটা সংখ্যার মধ্যে থেকে যে-কোন চারটেকে বসিয়ে দাও। হয়েছে তো ? এবার বাকি সংখ্যা চারটেকে চৌকো ঘরের বাঁ-দিকে, লম্বালম্বি চৌখুপীগুলোর ধারে ধারে লিখে ফেল। দেখি কি হল।"

সৌতি কাগজটা বাবার হাতে দিল (১১নং ছবি)—চৌখুপীগুলো বানায়নি কিন্তু সংখ্যাগুলো পরপর ঠিকই লিখেছে।



১১নং ছবি

"ঠিক হয়েছে। এবার পাশাপাশি লেখা সংখ্যা চারটের প্রথমটাকে, মানে সাতের সঙ্গে লম্বালম্বি লেখা সংখ্যাগুলোর প্রথমটা, মানে তিনটাকে যোগ করো। যোগফলটা সাতের তলায় আর তিনের

পাশে বসিয়ে দাও। তারপর আবার সাতের সঙ্গে এক-এক করে লম্বালম্বি ঘরের এক, দুই ও এক যোগ দাও এবং যোগফগুলো সাতের নিচে ও যথাক্রমে এক, দুই ও একের পাশে বসিয়ে দাও।

সৌতি লিখে দেখাল (১২নং ছবি)—

	৭	৮	১	২	
৩	১০				(৭+৩=১০)
১	৮				(৭+১=৮)
২	৯				(৭+২=৯)
১	৮				(৭+১=৮)

১২নং ছবি

"বেশ। এবার সাত ছাড়া পাশাপাশি লেখা বাকি সংখ্যাগুলো, মানে আট, এক আর দুইয়ের সঙ্গে, একই ভাবেই, এক-এক করে লম্বালম্বি ঘরের তিন, এক, দুই ও এক যোগ করো আর লিখে যাও। আগের বার যেমন প্রথমে সাতের সঙ্গে তিন যোগ করেছিলে, এবার তেমনি প্রথমে আটের সঙ্গে তিন যোগ করবে। কই করো দেখি!"

সৌতি একটু বাদে দেখাল (১৩নং ছবি)—

	৭	৮	১	২
৩	১০	১১	৪	৫
১	৮	৯	২	৩
২	৯	১০	৩	৪
১	৮	৯	২	৩

১৩নং ছবি

"ঠিকই করেছ। এবারে মিলিয়ে দেখো, আগের মতো এটাও একটা জাদুঘর। যোগফল ঠিক পঁচিশ হবে।"

সৌতি সংখ্যা বাছল,—আট, তিন, আর নয়। পড়ে রইল পাঁচ। যোগ করে দেখল—

৮+৩+৯+৫=২৫

সৌতির মুখে হাসির ঝিলিক। "যাই—মাকে খেলাটা দেখিয়ে আসি।"

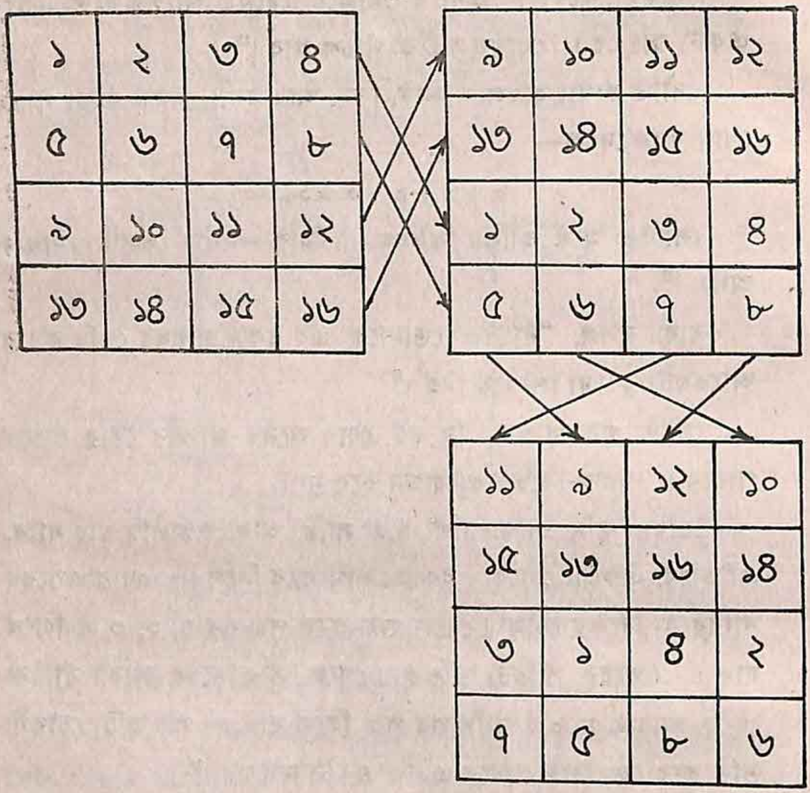
বাবা বলল, "দাঁড়াও তোমাকে এই রকম জাদুঘর তৈরি করার আরেকটা কায়দা শিখিয়ে দিই।"

সৌতি খুব খুশি। নিজেই এবার অনেক জাদুঘর তৈার করতে পারবে। মুখস্ত-বিদ্যের প্রয়োজন হবে না।

"ধরো, তুমি পাশাপাশি চার সারি আর লম্বালম্বি চার সারি, এইভাবে একটা চৌকো ঘরকে ভাগ করে নিলে। এবার ওপরের সারির বাঁ দিকের চৌখুপী থেকে শুরু করে পর পর ১, ২, ৩, ৪ লিখে যাও। ওপরের সারিটা ভর্তি হয়ে গেলে, তার নিচের সারির বাঁদিক থেকে আবার ৫, ৬ ইত্যাদি পর পর লিখে যাও। সব ক'টা চৌখুপী ভর্তি করে ফেললেই দেখবে এটাও একটা জাদুঘর।"

"কিন্তু বাবা, লোকে যে একবার দেখলেই জাদুঘর তৈরির কায়দাটা ধরে ফেলবে!"

"তারও উপায় আছে। এই দেখো—(১৪ নম্বর ছবি)—এখানে জাদুঘরের সংখ্যাগুলো শুধু সারি বদলে লেখা হয়েছে। প্রথমে পাশাপাশি-লেখা সংখ্যার সারিগুলোকে ওপর-নিচ করে বসানো হয়েছে। তারপর লম্বালম্বি-লেখা সংখ্যার সারিগুলোকে এপাশ-ওপাশ সরিয়ে বসানো হয়েছে। এইভাবে সারি না-ভেঙে যতই ওলট-পালট করে সংখ্যাগুলো সাজাও না কেন, জাদুঘর জাদুঘরই থাকবে।"



১৪নং ছবি

একটা খেলা আর ক'দিন ভাল লাগে। বন্ধুদের সব দেখানো হয়ে গেছে। ওদিকে বাবা আর নতুন খেলা শেখাচ্ছে না। সৌতি বিদ্রোহ করল। মাকে গিয়ে সোজা বলল, "আগে আমাকে খেলা শেখাতে বলো, না হলে অঙ্কে মন বসছে না। আর, তুমি তো মা জানোই—মন না-বসলে পড়াশোনা হয় না—"

অনেক কষ্টে হাসি চেপে মা বললে, "কে বলেছে, এসব কথা ?"

"কেন, তুমিই তো সেদিন বাবাকে বলছিলে, আমি শুনিনি বুঝি !"

"খুব পাকা হয়েছিস্, না !" বলেই মা খুব হেসে সৌতির গলা

জড়িয়ে একটা চুমু খেল। "দাঁড়াও—বাবা একটু জিরিয়ে নিক্। তারপর খেলা দেখাবে—"

"জিরোনো হয়ে গেছে। আমি রেডি। কই, কাগজ পেন্সিল কোথায়? আজ আরেক রকমের জাদুঘরের খেলা শেখাব।"

বাবা এবার যে চৌকো ঘরের খেলা দেখিয়েছে তাতে যে-কোন একটা সারি বেছে নিয়ে (পাশাপাশি হ'ক কি কোণাকুণি বা লম্বালম্বি) সংখ্যা ক'টা যোগ দিলে দেখা যায় যে, যোগফলের কোন তফাৎ হচ্ছে না। যেমন—(১৫নং ছবি)

৮	১	৬
৩	৫	৭
৪	৯	২

১৫নং ছবি

পাশাপাশি তিনটে সারি
৮ + ১ + ৬ = ১৫
৩ + ৫ + ৭ = ১৫
৪ + ৯ + ২ = ১৫

লম্বালম্বি তিনটে সারি
৮ + ৩ + ৪ = ১৫
১ + ৫ + ৯ = ১৫
৬ + ৭ + ২ = ১৫

কোণাকুণি দুটো সারি
৮ + ৫ + ২ = ১৫
৬ + ৫ + ৪ = ১৫

এই ন'টা সংখ্যাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসিয়ে আরো সাতটা জাদুঘর তৈরি করা যায়—(১৬নং ছবি)

৬	১	৮
৭	৫	৩
২	৯	৪

২	৭	৬
৯	৫	১
৪	৩	৮

৪	৩	৮
৯	৫	১
২	৭	৬

২	৯	৪
৭	৫	৩
৬	১	৮

৪	৯	২
৩	৫	৭
৮	১	৬

৬	৭	২
১	৫	৯
৮	৩	৪

৮	৩	৪
১	৫	৯
৬	৭	২

১৬নং ছবি

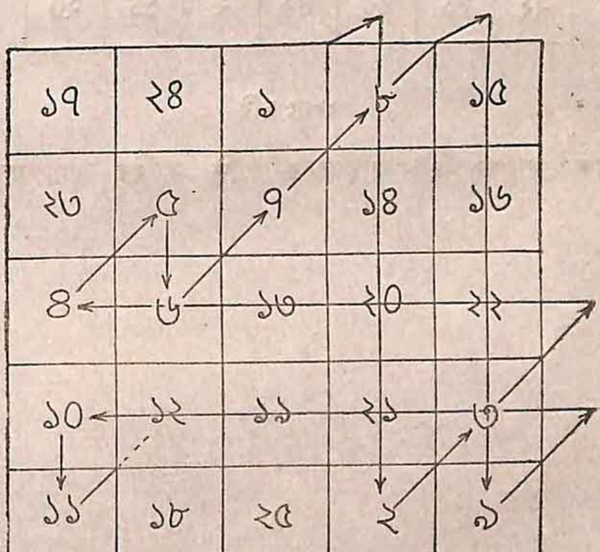
সব দেখে-শুনে সৌতি বাবাকে প্রশ্ন করল, "বাবা—এরকম ঘর কি করে তৈরি করে ?"

বাবা বললে, "জাদুঘর নানা রকমের হয়, সেগুলো তৈরি করার নিয়মও আছে অনেক। তার সবগুলো এখন বুঝতে পারবে না, শুধু একটা নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি। এই জাদুঘর তৈরির সময় প্রতি সারিতে বিজোড় সংখ্যার ছোট চৌখুপী নিতে হবে, যেমন তিন, পাঁচ, সাত বা নয় ইত্যাদি। ধরো, তুমি প্রতি সারিতে পাঁচটা করে চৌখুপী নিয়ে একটা জাদুঘর তৈরি করবে। প্রথমেই চৌকো একটা ঘর এঁকে তাকে পাশাপাশি ও লম্বালম্বি সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে নাও। এবার সবচেয়ে ওপরের সারির মাঝের চৌখুপীতে লেখ—১। এবার এই ছোট চৌখুপীর ওপর দিকের ডান কোণ দিয়ে ডান দিকে হেলানো ছোট্ট একটা লাইন টানো। তারপর এই লাইনের শেষ প্রান্ত থেকে সোজা নিচের দিকে একটা লাইন টানো যাতে ১-সংখ্যাটা যে লম্বালম্বি সারিতে রয়েছে, তার পাশের সারির শেষ চৌখুপী পর্যন্ত সেটা পৌঁছয়। যে চৌখুপীটায় পৌঁছলে, সেখানে লেখ—২। এবার ২-এর চৌখুপীর ওপরের ডান কোণ দিয়ে আগের মতোই ছোট্ট করে আরেকটা লাইন টানলেই সেটা আরেকটা চৌখুপীতে ঢুকে পড়বে। ৩ সংখ্যাটা এখানে বসিয়ে দাও। আবার ৩ সংখ্যা লেখা চৌখুপীটার ওপর দিকের ডান কোণ দিয়ে আগের মতো লাইন টানো। লাইনটা খোপ-কাটা ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেছে তো ? লাইনের শেষ প্রান্ত থেকে ৩-এর খোপের মাথার সারির একেবারে বাঁ-দিকের খোপে চলে যাও। এখানে লেখ—৪। আবার চারের খোপটা থেকে আগের মতো লাইন টেনে ৫ সংখ্যাটা বসিয়ে দাও। পাঁচ থেকে ছয় কিন্তু আগের মতো বাঁকা-লাইন টেনে বসানো চলবে না। এটা ভাল করে খেয়াল রাখবে। এই জাদুঘরের প্রতি সারিতে চৌখুপীর সংখ্যা পাঁচ বলেই, পাঁচের পর ছয় বসবে ঠিক তার নিচের খোপটায়। এমনি ভাবে দশের পর এগারো,

পনেরোর পর ষোল এবং কুড়ির পর একুশ ঠিক তলার খোপগুলোয় বসবে। কোন্ কোন্ সংখ্যার পরের সংখ্যাগুলো ঠিক তার তলার খোপে বসবে বুঝতে পেরেছ তো ?"

"হ্যাঁ বাবা—পাঁচের সঙ্গে পাঁচ যোগ করে দশ. তাই এগারো বসবে দশের নিচে। আবার দশের সঙ্গে পাঁচ যোগ করে পনের, তাই ষোল বসবে পনেরোর নিচে। তাই না ?"

"ঠিক বলেছ। এখন ধরো প্রতি সারিতে পাঁচ খোপের বদলে যদি সাত খোপ করে নিয়ে একটা জাদুঘর বানানো হত, সেখানেও কিন্তু সংখ্যা বসাবার কায়দা এই একই থাকত ! শুধু পাঁচের তলার খোপে ছয় না বসিয়ে, সাতের তলার খোপে আট বসত, চোদ্দ'র (সাত আর সাতে চোদ্দ বলে) তলার খোপে পনের বসত, একুশের (চোদ্দ আর সাতে একুশ বলে) তলার খোপে বাইশ বসত—বুঝেছ তো ? এবার আমি পাঁচ খোপের জাদুঘরটা তৈরি দেখিয়ে দিচ্ছি যার যোগফল সব সময়েই পঁয়ষট্টি হবে। (১৭নং ছবি)



১৭নং ছবি

অঙ্ক—৩

সৌতি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে জাদুঘর বানানোর কায়দাটা এক বারেই শিখে ফেলল। সাত খোপের জাদুঘর তৈরি করতেও ওর কোনো অসুবিধা হল না। (১৮নং ছবি)

৩০	৩৯	৪৮	১	১০	১৯	২৮
৩৮	৪৭	৭	৯	১৮	২৭	২৯
৪৬	৬	৮	১৭	২৬	৩৫	৩৭
৫	১৪	১৬	২৫	৩৪	৩৬	৪৫
১৩	১৫	২৪	৩৩	৪২	৪৪	৪
২১	২৩	৩২	৪১	৪৩	৩	১২
২২	৩১	৪০	৪৯	২	১১	২০

১৮নং ছবি

সাত খোপের এই জাদুঘরের প্রতি সারির যোগফল হবে ১৭৫।



একশ নিয়ে একশা

বাবা নিজেই সৌতিকে ডেকে বলল, "আজ আমার বড্ড মাথা ধরেছে। খুব বকবক করেছি কাল জাদুঘরের খেলা শেখাতে গিয়ে। আজ আর অত কথা বলতে পারব না।

"তার মানে আজ আর খেলা হবে না!"

"না—খুব সোজা একটা খেলা দেখাব। এক থেকে নয় পর্যন্ত ন'টা অঙ্ককে পরপর এমনভাবে লিখতে হবে যাতে উত্তর হয় একশ'। আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর তুমি চেষ্টা করো—"

বাবা লিখল, ১২৩ – ৪৫ – ৬৭ + ৮৯

"যোগ বিয়োগ করে দেখো কত উত্তর হয়।"

সৌতি দেখল একশ' হচ্ছে।

"তুমি এবার চেষ্টা করে দেখ তো, অন্য কোন রকম ভাবে সাজিয়ে একশ' উত্তর পাও কিনা!"

সৌতি অনেকক্ষণ ধরে নানারকম ভাবে চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না। বাবাকে বলল, "নাঃ—হচ্ছে না! এরকম বোধহয় আর হয় না।"

বাবা বলল, "হয় না? এই দেখো—"

১ + ২ + ৩৪ – ৫ + ৬৭ – ৮ + ৯ = ১০০

"আরো দেখবে?"

১২ – ৩ – ৪ + ৫ – ৬ + ৭ + ৮৯ = ১০০

"সবশুদ্ধ বারো রকম ভাবে এক থেকে নয় অবধি ন'টা অঙ্ককে

মাত্র একবার করে ও পর পর লিখে উত্তর হিসেবে একশ’ পাওয়া যেতে পারে। চেষ্টা করে দেখো। তাছাড়া এখানে এক থেকে শুরু করেছি লিখতে, আর শেষ করছি নয়-এ গিয়ে। এর ঠিক উল্টো করে, মানে নয় থেকে শুরু করে একে গিয়ে শেষ করলেও উত্তর হিসেবে একশ’ পাওয়া যেতে পারে। যেমন—”

৯৮ − ৭৬ + ৫৪ + ৩ + ২১ = ১০০

৯ − ৮ + ৭৬ + ৫৪ − ৩২ + ১ = ১০০

সৌতি প্রশ্ন করল, “এরকম করে লিখলে সবশুদ্ধ কত ভাবে একশ’ উত্তর পাওয়া যেতে পারে?”

“আঠারো ভাবে!”

“ওরে বাবা!”

“ঘাবড়াবার কিছু নেই। চেষ্টা করে দেখো! না পারলে, কাগজের তলায় উত্তরগুলো লেখাই রইল। আগে দেখো না কিন্তু!”

সোজাভাবে লিখলে: ১২৩ + ৪ − ৫ + ৬৭ − ৮৯; ১২৩ + ৪৫ − ৬৭ + ৮ − ৯; ১ + ২৩ − ৪ + ৫৬ + ৭ + ৮ + ৯; ১২ + ৩ + ৪ + ৫ − ৬ − ৭ + ৮৯; ১২ + ৩ − ৪ + ৫ + ৬৭ + ৮ + ৯; ১২৩ − ৪ − ৫ − ৬ − ৭ + ৮ − ৯; ১ + ২ + ৩ − ৪ + ৫ + ৬ + ৭৮ + ৯; − ১ + ২ − ৩ + ৪ + ৫ + ৬ + ৭৮ + ৯

উল্টোভাবে লিখলে: ৯ − ৮ + ৭ + ৬৫ − ৪ + ৩২ − ১; ৯ − ৮ + ৭৬ − ৫ + ৪ + ৩ + ২১; ৯ + ৮ + ৭৬ + ৫ + ৪ − ৩ + ২ − ১; ৯ + ৮ + ৭৬ + ৫ − ৪ + ৩ + ২ + ১; ৯৮ + ৭ + ৬ − ৫ − ৪ − ৩ + ২ − ১; ৯৮ + ৭ − ৬ + ৫ − ৪ − ৩ + ২ + ১; ৯৮ + ৭ − ৬ + ৫ − ৪ + ৩ − ২ − ১; ৯৮ + ৭ − ৬ − ৫ + ৪ + ৩ − ২ + ১; ৯৮ − ৭ + ৬ + ৫ + ৪ − ৩ − ২ − ১; ৯৮ − ৭ + ৬ + ৫ − ৪ + ৩ − ২ + ১; ৯৮ − ৭ + ৬ − ৫ + ৪ + ৩ + ২ − ১; ৯৮ − ৭ − ৬ + ৫ + ৪ + ৩ + ২ + ১; − ৯ + ৮ + ৭ + ৬৫ − ৪ + ৩২ + ১; − ৯ + ৮ + ৭৬ + ৫ − ৪ + ৩ + ২১; − ৯ − ৮ + ৭৬ − ৫ + ৪৩ + ২ + ১



যোগ-বিয়োগের গনৎকার

বাবা বলল, "সৌতি, আজ আমি গনৎকার হয়েছি। শিগ্গির খাতা, পেন্সিল আনো।"

ছুট—ছুট—ছুট—সৌতি আর দাঁড়ায়! মুহূর্তের মধ্যে খাতা বগলে হাজির।

"তিন অঙ্কের যে-কোন একটা সংখ্যা লেখো তো।" বাবা বললে।

সৌতি লিখল—৯৭৬।

বাবা কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বলল, "বেশ—এবার তুমি একটা ক'রে সংখ্যা বলবে আর আমি তারপর আরেকটা সংখ্যা বলবো। এইভাবে সবশুদ্ধ সেই পাঁচটা সংখ্যা লেখা হয়ে যাবে, তার যোগফল দাঁড়াবে—কত বলবো—দু'হাজার ন'শো চুয়াত্তর। বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ তো, লিখেই দেখ। তুমি আগে সংখ্যাটা লেখ।"

সৌতি লিখল—৩৭২

বাবা বলল, "এবার আমার পালা। আচ্ছা, লেখ—ছ'শো সাতাশ।"

এবার সৌতির পালা। সৌতি লিখল—১০৭

বাবা বলল, "এবার আমি তাহলে পঞ্চম বা শেষ সংখ্যাটা বলি, কেমন? আটশো বিরানব্বই। যোগ দিয়ে দেখো, গনৎকারের ভুল বার করতে পার কিনা।"

সৌতি যোগ দিল—৯৭৬ + ৩৭২ + ৬২৭ + ১০৭ + ৮৯২ = ২৯৭৪

মাত্র একবার করে ও পর পর লিখে উত্তর হিসেবে একশ' পাওয়া যেতে পারে। চেষ্টা করে দেখো। তাছাড়া এখানে এক থেকে শুরু করেছি লিখতে, আর শেষ করছি নয়-এ গিয়ে। এর ঠিক উল্টো করে, মানে নয় থেকে শুরু করে একে গিয়ে শেষ করলেও উত্তর হিসেবে একশ' পাওয়া যেতে পারে। যেমন—"

৯৮ − ৭৬ + ৫৪ + ৩ + ২১ = ১০০

৯ − ৮ + ৭৬ + ৫৪ − ৩২ + ১ = ১০০

সৌতি প্রশ্ন করল, "এরকম করে লিখলে সবশুদ্ধ কত ভাবে একশ' উত্তর পাওয়া যেতে পারে?"

"আঠারো ভাবে!"

"ওরে বাবা!"

"ঘাবড়াবার কিছু নেই। চেষ্টা করে দেখো! না পারলে, কাগজের তলায় উত্তরগুলো লেখাই রইল। আগে দেখো না কিন্তু!"

সোজাভাবে লিখলে: ১২৩ + ৪ − ৫ + ৬৭ − ৮৯; ১২৩ + ৪৫ − ৬৭ + ৮ − ৯; ১ + ২৩ − ৪ + ৫৬ + ৭ + ৮ + ৯; ১২ + ৩ + ৪ + ৫ − ৬ − ৭ + ৮৯; ১২ + ৩ − ৪ + ৫ + ৬৭ + ৮ + ৯; ১২৩ − ৪ − ৫ − ৬ − ৭ + ৮ − ৯; ১ + ২ + ৩ − ৪ + ৫ + ৬ + ৭৮ + ৯; − ১ + ২ − ৩ + ৪ + ৫ + ৬ + ৭৮ + ৯

উল্টোভাবে লিখলে: ৯ − ৮ + ৭ + ৬৫ − ৪ + ৩২ − ১; ৯ − ৮ + ৭৬ − ৫ + ৪ + ৩ + ২১; ৯ + ৮ + ৭৬ + ৫ + ৪ − ৩ + ২ − ১; ৯ + ৮ + ৭৬ + ৫ − ৪ + ৩ + ২ + ১; ৯৮ + ৭ + ৬ − ৫ − ৪ − ৩ + ২ − ১; ৯৮ + ৭ − ৬ + ৫ − ৪ − ৩ + ২ + ১; ৯৮ + ৭ − ৬ + ৫ − ৪ + ৩ − ২ − ১; ৯৮ + ৭ − ৬ − ৫ + ৪ + ৩ − ২ + ১; ৯৮ − ৭ + ৬ + ৫ + ৪ − ৩ − ২ − ১; ৯৮ − ৭ + ৬ + ৫ − ৪ + ৩ − ২ + ১; ৯৮ − ৭ + ৬ − ৫ + ৪ + ৩ + ২ − ১; ৯৮ − ৭ − ৬ + ৫ + ৪ + ৩ + ২ + ১; − ৯ + ৮ + ৭ + ৬৫ − ৪ + ৩২ + ১; − ৯ + ৮ + ৭৬ + ৫ − ৪ + ৩ + ২১; − ৯ − ৮ + ৭৬ − ৫ + ৪৩ + ২ + ১



যোগ-বিয়োগের গনৎকার

বাবা বলল, "সৌতি, আজ আমি গনৎকার হয়েছি। শিগ্‌গির খাতা, পেন্সিল আনো।"

ছুট—ছুট—ছুট—সৌতি আর দাঁড়ায়! মুহূর্তের মধ্যে খাতা বগলে হাজির।

"তিন অঙ্কের যে-কোন একটা সংখ্যা লেখো তো।" বাবা বললে।

সৌতি লিখল—৯৭৬।

বাবা কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বলল, "বেশ—এবার তুমি একটা ক'রে সংখ্যা বলবে আর আমি তারপর আরেকটা সংখ্যা বলবো। এইভাবে সবশুদ্ধ সেই পাঁচটা সংখ্যা লেখা হয়ে যাবে, তার যোগফল দাঁড়াবে—কত বলবো—দু'হাজার ন'শো চুয়াত্তর। বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ তো, লিখেই দেখ। তুমি আগে সংখ্যাটা লেখ।"

সৌতি লিখল—৩৭২

বাবা বলল, "এবার আমার পালা। আচ্ছা, লেখ—ছ'শো সাতাশ।"

এবার সৌতির পালা। সৌতি লিখল—১০৭

বাবা বলল, "এবার আমি তাহলে পঞ্চম বা শেষ সংখ্যাটা বলি, কেমন? আটশো বিরানব্বই। যোগ দিয়ে দেখো, গনৎকারের ভুল বার করতে পার কিনা।"

সৌতি যোগ দিল—৯৭৬ + ৩৭২ + ৬২৭ + ১০৭ + ৮৯২ = ২৯৭৪

"কী আশ্চর্য !"

"প্রথমে তুমি যে-সংখ্যাই বলো না, তার থেকে দু'ই বিয়োগ করে দু'হাজার যোগ করলেই উত্তরটা পাওয়া যাবে। আর আমি যে-দু'টো সংখ্যা লিখতে বলেছি, সে'দুটো ৯৯৯ থেকে তোমার লেখা ঠিক তার আগের সংখ্যাটা বাদ দিয়ে পেয়েছি। যেমন, তুমি লিখলে তিনশ' বাহাত্তর। অমনি আমি ৯৯৯ থেকে ৩৭২ বিয়োগ দিয়ে বললাম, ৬২৭ লেখো। এবার তুমি লিখলে ১০৭, আর আমিও ৯৯৯ থেকে ১০৭ বাদ দিয়ে ৮৯২ লিখতে বললাম। এই হচ্ছে গনৎকার হবার কায়দা। মুখে মুখে একটু বিয়োগ দিতে পারলেই হল। আচ্ছা—আমি বরং এবার খেলা শুরু করি, দেখি তুমি গনৎকার হতে পারো কিনা—"

বাবা লিখে দিল—২০১

সৌতি হিসেব করে বার করল, যোগফল হবে—২১৯৯ (কারণ, ২০১ − ২ = ১৯৯, ১৯৯ + ২০০০ = ২১৯৯)

এবার পরপর লিখে যাচ্ছি—

বাবা প্রথমে লিখেছিল—	২০১
তারপর বাবা আবার লিখল—	৯০১
সৌতি লিখল (৯৯৯ − ৯০১)	৯৮
এবার বাবা লিখল—	১০০
সৌতি লিখল (৯৯৯ − ১০০)	৮৯৯
যোগফল	২১৯৯

সৌতিও তার মানে গনৎকার হবার পরীক্ষায় উতরে গেছে। ওর গণনা নির্ভুল।



গনৎকারের আরেক কীর্তি

"সৌতি—আমার চোখে রুমাল বেঁধে দাও। আর তুমি কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসো।"

"না, না, রুমাল বাঁধার দরকার নেই। পেছন ফিরে বসলেই হবে। আমি জানি, তুমি খেলার সময় চোট্টামি করবে না।"

"বেশ—তুমি এবার এমন একটা তিন অঙ্কের সংখ্যা লেখো যার প্রথম আর তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে দু'য়ের তফাৎ। যেমন ১০৩-এর ১ আর ৩ বা ৭৬৫-এর ৫ আর ৭—বুঝেছ তো?"

"হ্যাঁ বাবা—একটা সংখ্যা লিখেও ফেলেছি।"

"সংখ্যাটাকে এবার উল্টো করে লেখো। মানে, সংখ্যাটা যদি ১০৩ হয় তাহলে উল্টো করে লিখলে সেটা দাঁড়াবে ৩০১। যে দুটো সংখ্যা পেয়েছো তার মধ্যে ছোটটাকে বড়টা থেকে বাদ দাও। তারপর বিয়োগফলটাকে ফের উল্টো করে লিখে বিয়োগফলের সঙ্গেই যোগ দাও।"

সৌতি ঘাড় নেড়ে যোগ-বিয়োগ সব করে ফেলেছে জানাতেই বাবা বলে দিল, "তোমার উত্তর হয়েছে ১০৮৯।"

সৌতি আর কত অবাক হবে! "কি করে বললে?"

"যে সংখ্যা দিয়েই খেলা শুরু করো, উত্তর ১০৮৯ হবেই।"

সৌতি আরেকবার যাচাই করে নিল বাবার কথা—

প্রথম সংখ্যা ধরল—৭০৫
উল্টো করে লিখল—৫০৭
বিয়োগ দিয়ে পেল—৭০৫ − ৫০৭ = ১৯৮
আবার উল্টো করে লিখল—৮৯১
বিয়োগফলের সঙ্গে যোগ দিতেই—৮৯১ + ১৯৮ = ১০৮৯



শুধু জেতার খেলা

যোগ-বিয়োগটা সৌতি ভালই রপ্ত করে ফেলেছে। তবু খেলার নেশা ভীষণ। বাবাকে রোজই খেলা দেখতে হয়। বাবারই এখন অবস্থা কাহিল। যাই হোক আজকের মতো বাবা একটা যোগ-বিয়োগের খেলা খুঁজে বার করেছে।

"সৌতি—আমি একটা করে সংখ্যা বলবো আর তুমি তার সঙ্গে এক বা দুই যোগ করে আরেকটা সংখ্যা বলবে। তারপর আমিও তাই করবো। যেমন আমি হয়তো বললাম, এক। তুমি তখন হয় দুই বলবে, নয়তো তিন। তারপর আমি হয় চার বলবো, নয়তো পাঁচ। বুঝেছ? এইভাবে সংখ্যাটা বাড়াতে বাড়াতে যে আগে কুড়িতে পৌঁছবে, তারই জিত। তাহলে আমি শুরু করি—"

বাবা বলল—২, সৌতি—৪, বাবা—৫, সৌতি—৭, বাবা—৮, সৌতি—১০, বাবা—১১, সৌতি—১২, বাবা—১৪, সৌতি—১৫, বাবা—১৭, সৌতি—১৮, বাবা—২০

"ব্যস্—জিতে গেছি!"

"আবার একবার খেলো। এবার আমি শুরু করি—"

সৌতি বলল—২, বাবা—৩, সৌতি—৫, বাবা—৬, সৌতি—৮, বাবা—৯, সৌতি—১০, বাবা—১১, সৌতি—১৩, বাবা—১৪, সৌতি—১৬, বাবা - ১৭, সৌতি—১৮, বাবা—২০

"আবার হেরে গেলে।"

"শিখিয়ে দাও না বাবা জেতার কায়দাটা।"

"ব্যাপার হচ্ছে, যে আগে সতেরোয় পৌঁছতে পারবে, সেই জিতবে। কারণ, আমি সতেরোর পৌঁছনোর পর তুমি আঠারই বলো কি উনিশই বলো, আমি ঠিক কুড়িতে পৌঁছে যাব। ঠিক একই ভাবে সতেরোয় পৌঁছতে হলে, আগে চোদ্দয় পৌঁছনো চাই। আবার চোদ্দয় পৌঁছতে হলে তার আগে এগারোয় ও একইভাবে পরপর আট, পাঁচ ও ত্'য়ে পৌঁছনো চাই। কাজেই কেউ যদি প্রথমেই ত্'ই বলে খেলা শুরু করে আর খেলার কায়দাটা জানে, তাকে আর হারানো যাবে না। সে তখন ত্ই থেকে পাঁচে, পাঁচ থেকে আটে, ও আট থেকে যথাক্রমে এগারো, চোদ্দ, সতেরো ও শেষ পর্যন্ত কুড়িতে পৌঁছে যাবে।



সৌতি এখনো গুণ করতে ভুল করে। সেটা নিয়ম না-জানার জন্যে নয়, অন্যমনস্ক হয়ে যায় বলে। নয় আর ছ'য়ে গুণ করে চুয়ান্ন হ'ল, চার নামাল ঠিক জায়গায় কিন্তু হাতের পাঁচটা ক্রিকেটের

হাউ—জ্ হ্যাটের চিৎকারে বিস্মরণ হয়ে গেল। কে বোল্ড আউট হ'ল সেটা তখন তার মাথায় ঘুরছে। অতএব—গোল্লা!

বাবা ডাকল, "সৌতি, এদিকে এসো।"

ব্যাপার বুঝে সৌতি আগে থেকেই মুখ কাঁচুমাচু করে এসে দাঁড়াল।

"আবার গুণ-ভাগের অঙ্ক ভুল হল কেন?"

কোন জবাব নেই।

"তার মানে এবার গুণের খেলা দেখাতে হবে, এই তো?"

সৌতি একবারের জায়গায় সাতবার ঘাড় নাড়ল। তারপর কি মনে হতে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা বাবা, গুণ-ভাগগুলো মেশিন দিয়ে করা যায় না না?"

সত্যিই তো, আজকাল কি আর কেউ দুরমুশ দিয়ে রাস্তা পেটায়? রোড-রোলার ঘড়ঘড় করে কত সহজে সে-কাজ করে দিচ্ছে। সবই তো মেশিনে হচ্ছে, তবে অঙ্কই বা হবে না কেন।

বাবা বলল, "হ্যাঁ, এমন অনেক মেশিন আছে যা দিয়ে অঙ্ক করা যায়। কিন্তু সেরকম মেশিন সবাইকার কাজে লাগে না। দামও অনেক। তাছাড়া সব জায়গায় মেশিন ব্যবহার করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে এমন কোন কথা নেই।"

"বারে—মেশিন চালালে তো মানুষের কষ্ট কমে যায়—"

"তা যায় হয় তো, কিন্তু সেখানেও অনেক সময় মুস্কিল হয়। যেমন ধরো, আমাদের দেশে আগে লোকে হাতে কাপড় বুনতো তাঁত চালিয়ে। কী সুন্দর ছিল সেসব কাপড়। তুমি তো দেখেছ জাদুঘরে আছে কিছু কিছু। তারপর ইংরেজরা এক সময় কলে কাপড় বুনে সেই কাপড় এ দেশে বিক্রি করতে শুরু করল। যন্ত্রের সাহায্যে খুবই সহজে, সস্তায় আর এত বেশি করে কাপড় তৈরি হতে শুরু হল যে, লোকে তাঁতের কাপড় কেনা বন্ধ করে দিল। যদিও কলের

কাপড় মোটেই তাঁতের মতো অত সুন্দর হত না। আমাদের দেশের তাঁতীরা একেবারে মারা পড়ল।”

“কিন্তু বাবা, যেসব ইংরেজ তাঁতী কলে কাপড় তৈরা শুরু করেছিল তাদের নিশ্চয়ই অনেক পয়সা হয়েছিল?”

“না সৌতি—তাও কিন্তু হয়নি। কাপড়ের কলের দাম এত বেশি যে সে-সব জিনিস গরিব তাঁতীরা নিজেরা কিনতে পারেনি। বড়লোকের কারখানায় তারা চাকরি করতো। তাই কলে কাপড় বোনা শুরু হতে ভারতের তাঁতীরাও মরলো আর ইংরেজ মিস্ত্রিদেরও ভাগ্য ফিরল না।”

“কিন্তু তাঁতীরা যদি নিজেরা কল বসিয়ে সেই কল চালায়?”

“হ্যাঁ—তা যদি হয়, যারা কল চালাবে তারা নিজেরাই যদি সেই কলের মালিক হতে পারে, তাহলে মেশিন সত্যিই মানুষের কাজে লাগবে। কিন্তু যতদিন না তা হচ্ছে—”

“আমাকে এই বিচ্ছিরি গুণ ভাগগুলো মেশিন ছাড়াই করতে হবে।” সৌতি খুব বিরক্ত।

বাবা হেসে বলল, “দাঁড়াও—আজ তোমাকে গুণ করার এমন কতকগুলো সহজ নিয়ম শিখিয়ে দেবো যে মেশিনও হার মানবে।”

সৌতি লাফিয়ে উঠল। খাতা-পেন্সিল নিয়ে হাজির।



গুণ-মেশিনের দরকার নেই

বাবা বলল, "ধরো, তুমি এমন দুটো সংখ্যা গুণ করবে যা পরস্পর সমান এবং তাদের শেষ অঙ্কটা পাঁচ। যেমন, ৭৫-কে ৭৫ দিয়ে গুণের বেলা। এই রকম গুণের সময় প্রথমে দেখতে হবে, সংখ্যার শেষ অঙ্ক, মানে পাঁচটাকে ছেড়ে দিলে কি থাকে। ৭৫-এর ৫ ছেড়ে দিলে থাকে সাত। এবার এই সাতকে ঠিক তার পরের সংখ্যা, অর্থাৎ আট দিয়ে গুণ করে সেই গুণফলের পিঠে ২৫ বসিয়ে দিলেই উত্তর বেরিয়ে পড়বে। করে দেখো।"

সৌতি লিখল—৭ × ৮ = ৫৬

৫৬ এর পিঠে ২৫ বসালে—৫৬২৫

বাবা বলল, "এবার ৭৫-কে ৭৫ দিয়ে গুণ করে মিলিয়ে নাও।"

```
   ৭৫
 × ৭৫
 ----
  ৩৭৫
 ৫২৫
 ----
 ৫৬২৫
```

সৌতি ব্যাপারটাকে সড়গড় করে নেবার জন্যে নিজেই ৯৫-কে ৯৫ দিয়ে গুণ করতে শুরু করল।

৯৫-এর পাঁচটাকে ছেড়ে লিখল—৯

৯-এর পরের সংখ্যা—১০

গুণ করে পেল—৯ × ১০ = ৯০

৯০-এর পিঠে ২৫ বসালে—৯০২৫

উত্তরটা মিলছে কিনা দেখতে সৌতি গুণ করল—

```
   ৯৫
   ৯৫
 ────
  ৪৭৫
 ৮৫৫×
 ────
 ৯০২৫
```

"এবারে ঠিক মিলেছে। গুণ করার এরকম সহজ কায়দা আরো কয়েকটা শিখিয়ে দাওনা বাবা!"



গুণ করার আরেক কায়দা

বাবা বললে, "ধরো, তোমায় এমন দু'টো সংখ্যা গুণ করতে হবে, যে-দুটোর মধ্যে দু'য়ের তফাৎ। যেমন পাঁচ আর সাত বা তেরো আর পনেরো। বুঝেছো তো? এরকম গুণের বেলায় এই সংখ্যা দুটোর মাঝখানের সংখ্যাটাকে প্রথমে বার করে নিতে হবে। যেমন পাঁচ আর সাতের মাঝখানে আছে ছয়, তেরো আর পনেরোর মাঝখানে আছে চোদ্দ। এবার এই মাঝখানের সংখ্যাটাকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করে গুণফল থেকে এক বিয়োগ দিলেই উত্তর পেয়ে যাবে। ধরো উনিশকে একুশ দিয়ে গুণ করবে। এই দুটো সংখ্যার মাঝখানে আছে কুড়ি। তার মানে প্রথমে কুড়িকে কুড়ি

দিয়ে গুণ করতে হবে। শেষে শূন্য থাকলে গুণের বেলায় যে সুবিধে হয় সে তো জানোই। শূন্যগুলো বাদ দিয়ে গুণ করে তারপর গুণফলের পিছনে বাদ-দেওয়া শূন্যগুলো বসিয়ে দিলেই উত্তর পাওয়া কুড়িকে কুড়ি দিয়ে গুণ করলে কত হয় বলো এবার ?"

সৌতি বলল, "দু'ই দু'গুণে চার, আর চারের পিঠে দু'টো শূন্য, তার মানে চারশো।"

"এবার চারশো থেকে এক বিয়োগ দিলে, পাওয়া গেল তিনশো নিরানব্বই। এবার তুমি একুশকে উনিশ দিয়ে গুণ করে দেখো তো উত্তর মিলেছে কিনা!"

```
  ২১
  ১৯
-----
 ১৮৯
 ২১×
-----
 ৩৯৯
```



দু'য়ের নামতাটা জানলেই হ'ল

গুণ করার আরো সহজ নিয়ম আছে কিনা জানবার জন্যে সৌতির ভীষণ আগ্রহ। লাইব্রেরি থেকে আনা অঙ্কের সব ক'টা বই টেনে এনে বাবার হাতে প্রায় গুঁজে দিয়েছে। "দেখো না বাবা, ওই রকম সহজে গুণ করার আর কোন নিয়ম আছে কিনা!" বাবা বইগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে শুরু করে। অমন যে সৌতি, এক মিনিট

চুপ করে বসে থাকাও যার কাছে শাস্তি, ঠায় বসে আছে। মুখে রা-টি নেই।

"আচ্ছা সৌতি, সব নামতাগুলো তোমার মুখস্থ আছে?"

"হ্যাঁ বাবা—শুনবে?"

"না, না—কিন্তু ধরো আমাদের কথা একটুও না শুনে সারাদিন খালি ডাংগুলি খেলে কাটিয়ে একদিন নামতাগুলো গেল গণ্ডগোল হয়ে! দু'য়ের নামতা বাদে কোনটাই আর মনে পড়ছে না। এরকম যদি হয় তাহলে কি তুমি যে-কোন গুণ দিলে করতে পারবে?"

"উঁহুঁ তা কি করে হবে!"

"সেই কায়দাটাই আজ শিখিয়ে দেবো। যে কোন দু'টো সংখ্যা বলো যা গুণ করতে চাও।"

"৩৬-কে ৮৭ দিয়ে গুণ করবো।"

"বেশ—খাতার পাতার বাঁ দিকে লেখো ৩৬ আর খানিকটা ফাঁক রেখে, একই লাইনে ডান দিকটায় লেখে ৮৭।"

সৌতি লিখল—

৩৬	৮৭

এবার ৩৬-কে ২ দিয়ে ভাগ করে, ভাগফল ৩৬-এর নিচে আর ৮৭-কে দু'ই দিয়ে গুণ করে, গুণফল ৮৭-এর নিচে লেখো।

সৌতি লিখল—

৩৬	৮৭
১৮	১৭৪

"লিখেছো তো! আবার ১৮-কে দুই দিয়ে ভাগ করো। এই রকম ভাবে একটাকে দুই দিয়ে ভাগ আর একটাকে দুই দিয়ে গুণ করে পর পর লিখে যাও। যতক্ষণ না ভাগফল ১-এ পৌছচ্ছে। ভাগশেষ যদি কখনো থাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।"

সৌতি লিখল—

৩৬	৮৭
১৮	১৭৪
৯	৩৪৮
৪	৬৯৬
২	১৩৯২
১	২৭৮৪

"কই দেখি কি হল। হুঁ—ঠিকই হয়েছে। এবার বাঁ দিকের সারিতে, যেখানে যেখানে জোড় সংখ্যা দেখেছো, ঠিক তার ডান পাশে লেখা সংখ্যাগুলো কেটে বাদ দিয়ে দাও।"

সৌতি লিখল—

বাঁ সারি	ডান সারি
জোড় সংখ্যা ৩৬	৮৭ ×
জোড় সংখ্যা ১৮	১৭৪ ×
৯	৩৪৮
জোড় সংখ্যা ৪	৬৯৬ ×
জোড় সংখ্যা ২	১৩৯২ ×
১	২৭৮৪

"ডান সারির যে-সংখ্যাগুলো কাটা পড়েনি, সেগুলো এবার যোগ দাও।"

সৌতি যোগ দিল—৩৪৮ + ২৭৮৪ = ৩১৩২

"এই যোগফলটাই উত্তর।"

তাই নাকি! মিলিয়ে দেখি তো!" সৌতি ৩৬-কে ৮৭ দিয়ে গুণ করল—

```
   ৩৬
   ৮৭
 ─────
  ২৫২
 ২৮৮×
 ─────
 ৩১৩২
```

"কী মজা রে বাবা!" সৌতি আনন্দে আটখানা।

সৌতির মা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বাপ-বেটার কাণ্ড দেখছিল। সৌতির বাবা জিগ্যেস করল, "গুণের এই মজার নিয়মটা তুমি জানতে?" মা কিছুই বলল না। সৌতি ততক্ষণে ৫১কে ৯৬ দিয়ে গুণ করতে শুরু করে দিয়েছে—

	৫১	৯৬
	২৫	১৯২
জোড় সংখ্যা	১২	৩৮৪ ×
জোড় সংখ্যা	৬	৭৬৮ ×
	৩	১৫৩৬
	১	৩০৭২

৯৬ + ১৯২ + ১৫৩৬ + ৩০৭২ = ৪৮৯৬



উত্তরটা ঠিক হয়েছে কিনা না-মিলিয়ে কি শান্তি আছে। সৌতি গুণ করল—

```
   ৯৬
   ৫১
 ────
   ৯৬
 ৪৮০×
 ────
 ৪৮৯৬
```

সৌতি হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। "এটাও মিলে গেল। তার মানে যে-কোন গুণই মিলবে।"

সৌতির মার মুখে একটুও হাসি নেই। "এই খেলাটা মোটেই ভাল নয়।"

"কেন—কেন?" সৌতির বাবা অবাক।

"কেন আবার! দু'য়ের নামতা জানলেই যদি সব গুণ হয়ে

যায়, ছেলেরা আর নামতা শিখবে ভেবেছো? দেখো, সৌতিই হয়তো আর নামতা মুখস্থ করবে না।"

বাবা হেসে প্রশ্ন করল, "কিরে, মায়ের কথাই সত্যি হবে নাকি?"

"ধ্যাত্—এতো অঙ্কের খেলা। দেখছো না কত সময় লাগে এরকম ভাবে গুণ করতে।"

মা হেসে বলল, "বুদ্ধি তো যথেষ্ট, কথাতেও পণ্ডিত, কাজের বেলায় কি হয় সেটাই দেখবো।"



গুণ মেলানোর মজা

সেদিন সৌতি খাতা পেন্সিল নিয়ে আসতেই বাবা বলল, "চট্ করে একটা গুণ করে ফেলতো দেখি। এই ধরো—৯৮৯কে ৭১৩ দিয়ে।"

সৌতি সন্দেহের চোখে বাবার দিকে একবার তাকিয়ে তারপর গুণ করতে বসল।

```
   ৯৮৯
   ৭১৩
  ------
  ২৯৬৭
  ৯৮৯×
৬৯২৩××
-------
৭০৫১৫৭
```

বাবার হাতে খাতাটা দিয়ে সৌতি বলল, "এই বুঝি মজার অঙ্ক! বিরাট একটা গুণ!"

"আচ্ছা সৌতি, তুমি এবার যে দু'টো সংখ্যা গুণ করেছো, আলাদা আলাদা করে তার প্রতিটি অঙ্ক পাশাপাশি যোগ দাও তো দেখি।"

সৌতি কিছুই বুঝল না।

"খুলেই বলি। প্রথমে ৯৮৯ সংখ্যাটার ৯, ৮, আর ৯ যোগ করো।"

সৌতি যোগ করল—৯+৮+৯=২৬

"এই যে যোগফল পেলে, এটা দু'অঙ্কের—একটা অঙ্ক দুই আর অন্যটা ছয়। এ দুটোকেও আগের মতো যোগ করো। এইভাবে পাশাপাশি অঙ্কগুলো বার বার যোগ করতে হবে, যতক্ষণ না যোগফল এক অঙ্কের হবে।"

সৌতি যোগ করল—২+৬=৮

"আর যোগ করতে হবে না" সৌতি বলল।

"এবারে ৭১৩ সংখ্যাটার অঙ্কগুলোকেও ওই রকম পাশাপাশি ভাবে যোগ করো।"

সৌতি যোগ করল—৭+১+৩=১১

আবার যোগ করল—১+১=২

"এবার আগের যোগফলকে এই যোগফল দিয়ে গুণ করো।"

সৌতি লিখল—৮×২=১৬

"এবার এই গুণফলের অঙ্কগুলোকে ওই রকম ভাবে পাশাপাশি যোগ করো।"

সৌতি লিখল—১+৬=৭

"বেশ। এবার মূল গুণফলের অঙ্কগুলোকেও এমনিভাবে পাশা-পাশি যোগ করে যাও, যতক্ষণ না এক অঙ্কের যোগফল পাচ্ছ। করে দেখাও তো।"

সৌতি গুণফল ৭০৫১৫৭-কে ভেঙে লিখল—

৭ + ০ + ৫ + ১ + ৫ + ৭ = ২৫

তারপর দু'অঙ্কের যোগফল বলে আবার লিখল—২ + ৫ = ৭

বাবা খাতার ওপর ঝুঁকে দেখছিল। যোগফল শেষ পর্যন্ত সাত হয়েছে দেখেই বলে উঠল, "তোমার গুণ ঠিক হয়েছে। এর আগেও তুমি সাত পেয়েছ, মনে আছে? ওই যে ৯৮৯ আর ৭১৩-কে পাশাপাশি যোগ করলে, তারপর এই যোগফল দুটো গুণ করে গুণফলটাকেও পাশাপাশি যোগ করলে—সেবারেও সাত পেয়েছিলে না শেষ পর্যন্ত? যখনই এইরকম সংখ্যা দুটো মিলে যাবে, বুঝবে গুণ করতে ভুল হয়নি।"

বাবা ভেবেছিল সৌতি হয়তো কিছু জানতে চাইবে। কিন্তু সৌতি খাতার ওপর ঘাড় গুঁজে বসে লিখে যাচ্ছে। একটু বাদে বাবা জিগ্যেস করল, "কি করছো বলতো?"

সৌতি একটু বাদে উত্তর দিল। খাতাটা বাবার হাতে তুলে দিয়েছে। "আরেকটা গুণ করে দেখছিলাম তোমার কথা ঠিক কিনা!"

বাবা দেখল সৌতি একটা ছোটখাটো গুণ বেছে নিয়েছে পদ্ধতিটা যাচাই করার জন্যে—

৫৬৯	৫ + ৬ + ৯ = ২০	২ + ০ = ২
৯৮	৯ + ৮ = ১৭	১ + ৭ = ৮
৪৫৫২	৮ × ২ = ১৬	১ + ৬ = ৭
৫১২১ ×		
৫৫৭৬২	৫ + ৫ + ৭ + ৬ + ২ = ২৫	২ + ৫ = ৭

এরপর সৌতি ক'দিন ধরে নাগাড়ে গুণ করে গেল শুধু গুণফল মেলবার জন্যেই।



ছাপাখানায় ছাপার মতো

"আচ্ছা সৌতি, বলতো, ছাপাখানায় কি হয় ?"

"বই ছাপা হয়।"

"তার মানে ছাপাখানায় যন্ত্র দিয়ে যে-কোন লেখার খুব তাড়াতাড়ি কতগুলো নকল তৈরি করে ফেলা যায়।"

সৌতি ঘাড় নাড়ল।

"ঠিক এই ছাপাখানার মতো একটা সংখ্যা আছে। এই সংখ্যাটাকে যদি বিশেষ কয়েকটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয়—একটা মজার ব্যাপার ঘটে। গুণফলের সব অঙ্কগুলোই সমান। বুঝতে পারলেন না ? ১২৩৪৫৬৭৯—এই সংখ্যাটাকে ৯ দিয়ে গুণ করে দেখতো কি হয়।"

সৌতি গুণ করল— ১২৩৪৫৬৭৯

৯

১১১১১১১১১

সত্যিই তো—এ যেন পরপর ন'বার ১ সংখ্যাটা ছাপা হয়েছে। তাই না বাবা ?"

"দেখলে তো! আচ্ছা, এবার মাথা খাটিয়ে বলতো দেখি, ঠিক এইভাবে যদি ন'বার দুই সংখ্যাটাকে 'ছেপে' বার করতে হয়, তাহলে ১২৩৪৫৬৭৯-কে কোন্ সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে ?"

সৌতি ভুরু কুঁচকে কাগজের দিকে তাকাল। মনে মনে আওড়াল,

"এক-এর জায়গায় গুণফলকে যদি দুই হতে হয়, তাহলে—তাহলে গুণফলকে নিশ্চয় দুই দিয়ে গুণ করতে হবে। তার মানে, আগের মতো সংখ্যাটাকে নয় দিয়ে গুণ না করে, ন' দু'গুণে আঠার দিয়ে—"

সৌতির বাবা বলে উঠল, "সাবাস ! ঠিক ধরেছো। আচ্ছা, দু'য়ের বদলে চার পেতে হলে কি দিয়ে গুণ করতে—"

"বলছি, বলছি—", সৌতি বাবাকে কথাই শেষ করতে দিল না। "চার ন'য়ে ছত্রিশ—ছত্রিশ দিয়ে গুণ করতে হবে। একবার মিলিয়ে দেখি তো—"

$$\begin{array}{r} ১২৩৪৫৬৭৯ \\ ১৮ \\ \hline ২২২২২২২২২ \end{array} \qquad \begin{array}{r} ১২৩৪৫৬৭৯ \\ ৩৬ \\ \hline ৪৪৪৪৪৪৪৪৪ \end{array}$$



ভাগ না-করলেও চলে

"বিরাট একটা সংখ্যাকে ভাগ না-করেও বলে দেওয়া যায়, সেটা দুই দিয়ে ভাগ করলে মিলবে কিনা। স্কুলে তো অনেক ভাগ করছো। এই নিয়মটা কি জানো ?" সৌতিকে বাবা জিগ্যেস করল।

"না তো বাবা। পরে শেখাবে বোধহয়। তুমি বলো না।"

"কোন সংখ্যার শেষে যদি জোড় সংখ্যা থাকে, মানে যে-কোন সংখ্যার শেষ অঙ্কটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করা যায়, তাহলে পুরো সংখ্যাটাকেও দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে।"

"তাইতো—মনে পড়েছে। মাস্টার মশায় বলেছিলেন। ভুলে গেছলাম। আচ্ছা বাবা, তিন দিয়ে ভাগ দেওয়া যাবে কিনা, ভাগ না করেও বলা যায় ?"

"হ্যাঁ। কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলোকে যোগ করলে, সেই যোগফলকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করা যায়, বুঝবে সংখ্যাটাকেও তিন দিয়ে ভাগ করা যায়। যেমন ধরো, ১২৩৫১—এই সংখ্যাটার অঙ্কগুলো যোগ করলে কত হয় ?"

সৌতি বলল—১ + ২ + ৩ + ৫ + ১ = ১২

"বারোকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায়। তাই এই সংখ্যাটাকেও তিন দিয়ে ভাগ করা যাবে। কোন ভাগশেষ থাকবে না। করে দেখো—"

```
৩)১২৩৫১(৪১১৭
  ১২
  ----
    ৩
    ৩
   ----
     ৫
     ৩
    ----
     ২১
     ২১
    ----
```

"চার দিয়ে ভাগ যাবে কিনা বলা যায় ?"

"তাও বলা যায়। শুধু চার কেন, পাঁচ, ছয়, আট আর নয় দিয়ে ভাগ করা যাবে কিনা, প্রত্যেকটারই খুব সোজা কতকগুলো নিয়ম আছে। খাতা দাও ; একটা একটা করে লিখে দিচ্ছি, না হলে পরে মনে থাকবে না।"

৪ দিয়ে ভাগ

সংখ্যার শেষ দুটো অঙ্ককে যদি চার দিয়ে ভাগ করা যায়, পুরো সংখ্যাটাকেও ভাগ করা যাবে। যেমন, ১২৩৪৮-এর শেষ দুটো সংখ্যা ৪৮-কে চার দিয়ে ভাগ করা যায়, তাই ১২৩৪৮-কেও ৪ দিয়ে ভাগ করা যাবে। কিন্তু ১২৩৪৫-কে ৪ দিয়ে ভাগ করা যাবে না কারণ, ৪৫-কে ৪ দিয়ে ভাগ করলে ১ ভাগশেষ থাকে।

৫ দিয়ে ভাগ

সংখ্যার শেষে যদি পাঁচ বা শূন্য থাকে তাহলে সংখ্যাটাকে ৫ দিয়ে ভাগ করা যাবে। যেমন ২৫ বা ৩০০ ইত্যাদি ৫ দিয়ে বিভাজ্য।

৬ দিয়ে ভাগ

কোন সংখ্যাকে যদি ২ ও ৩ এই দুটো সংখ্যা দিয়েই ভাগ করা যায়, তাহলে সেই সংখ্যাকে ৬ দিয়ে ভাগ করা যাবে। যেমন ১২৩৪২-কে ২ দিয়ে ভাগ করা যায়, আবার তিন দিয়েও ভাগ করা যায়। কারণ, এর শেষ অঙ্ককে দুই দিয়ে ভাগ করা যায়, আর অঙ্কের সমষ্টি (১+২+৩+৪+২=১২) ১২ কেও ২ দিয়ে ভাগ করা যায়। তাই ১২৩৪২-কে ৬ দিয়েও ভাগ করা যাবে।

৮ দিয়ে ভাগ

কোন সংখ্যার শেষ তিনটি অঙ্ককে যদি ৮ দিয়ে ভাগ করা যায়, তাহলে সংখ্যাটিকেও ৮ দিয়ে ভাগ করা যাবে। যেমন, ৬৭৫৩৮৯৮৪ কে ৮ দিয়ে ভাগ করা যাবে, কারণ এর শেষ তিনটি অঙ্ক ৯৮৪-কে ৮ দিয়ে ভাগ করা যায়।

```
৮)৯৮৪(১২৩
  ৮
 ----
  ১৮
  ১৬
 ----
   ২৪
   ২৪
  ----
```

৯ দিয়ে ভাগ

কোন সংখ্যার অঙ্কের সমষ্টিকে যদি ৯ দিয়ে ভাগ করা যায়, সংখ্যাটিকেও ৯ দিয়ে ভাগ করা যাবে। যেমন, ১২৩৪২৬কে ৯ দিয়ে ভাগ করা যাবে, কারণ এর অঙ্কের সমষ্টি (১+২+৩+৪+২+৬=১৮) ১৮কে ৯ দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে।



অঙ্কের খেলায় মেতে সৌতির বুদ্ধিটা বেশ চকচকে হয়েছে। অন্যান্য বার জন্মদিনে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করবে বলে বায়না ধরে। এবার তার অন্য মতলব। জন্মদিনে ম্যাজিক দেখাবে। অঙ্কের ম্যাজিক। বাবার কাছে আর্জি পেশ করেছি, ক'টা নতুন খেলা শিখিয়ে দেবার জন্যে। আগের খেলাগুলো বন্ধুদের দেখানো হয়ে গেছে।

বাবা তো সৌতির সব কথাতেই রাজী। রাজী না হয়ে কি উপায় আছে! সৌতি যা কাণ্ডটা জোড়ে তখন—বাবা বলেছে, রোজ একটা করে খেলা শিখিয়ে দেবে। সৌতি সেগুলো লিখে রাখবে, তারপরে অভ্যেস করে নিলেই হল। এখনো জন্মদিনের ঢের দেরি।

প্রথম ম্যাজিক

বাবা বলল, "মনে মনে যে-কোন একটা সংখ্যা ঠিক করে পাঁচ দিয়ে তাকে গুণ করো। এবার দশ যোগ ক'রে, চার দিয়ে গুণ ক'রে, দুই যোগ দিয়ে, পাঁচ দিয়ে গুণ করো—কত উত্তর হল ?"

সৌতি বলল, "পাঁচশো দশ।"

"তার মানে তুমি প্রথমে তিন ধরেছিলে।"

"কি করে বুঝলে ?"

"খুব সোজা ব্যাপার। পরপর যোগ আর গুণ করার পর শেষকালে যে উত্তরটা পাওয়া যায়, তার থেকে দু'শো দশ বিয়োগ করে একশো দিয়ে ভাগ করলেই সংখ্যাটা বেরিয়ে পড়ে। তাই পাঁচশো দশ থেকে দু'শো দশ বিয়োগ দিয়ে তিনশো পেয়েছিলাম, আর তিনশোকে একশো দিয়ে ভাগ দিতেই—তিন !"

"ধরে তিন না ধরে যদি সাত ধরতাম।"

"একই হতো। করে দেখ—"

সৌতি লিখল—৭ × ৫ = ৩৫, ৩৫ + ১০ = ৪৫,

৪৫ × ৪ = ১৮০, ১৮০ + ২ = ১৮২, ১৮২ × ৫ = ৯১০

"ন'শো দশ থেকে দু'শো দশ বাদ দিলে কত থাকে ?"

সৌতি বলল, "সাতশো। আর সাতশোকে একশো দিয়ে ভাগ দিলেই সেই সাত।"

দ্বিতীয় ম্যাজিক

বাবার কথা অনুযায়ী সৌতি তিনটে লুডো খেলার ছক্কা যোগাড় করে আনল।

"ছক্কা তিনটে আমায় না-দেখিয়েই চালো।"

সৌতি হাত নেড়ে একসঙ্গে ছক্কা তিনটে চালল।

"এবার প্রথম ছক্কায় যে সংখ্যাটা উঠেছে তাকে দুই দিয়ে গুণ করে পাঁচ যোগ করো। তারপর আবার পাঁচ দিয়ে গুণ করে দ্বিতীয় ছক্কার সংখ্যাটার সঙ্গে যোগ দাও। দিয়েছ ? এবার এই যোগফলকে দশ দিয়ে গুণ করে তৃতীয় ছক্কার সংখ্যার সঙ্গে যোগ দাও। কত হল ?"

সৌতি বলল—৪৮৫

"তাহলে প্রথম ছক্কায় দুই, দ্বিতীয় ছক্কায় তিন, আর তৃতীয় ছক্কায় পাঁচ পড়েছিল।"

"ঠিক বলেছো !"

"কি করে বার করলাম জানো? যেই তুমি বললে চারশো পঁচাশি উত্তর হয়েছে, আমি তার থেকে দু'শো পঞ্চাশ বিয়োগ করতেই এই সংখ্যা তিনটে বেরিয়ে পড়েছে। আরেকবার ছক্কা চেলে দেখো মেলে কিনা।"

সৌতি ছক্কা চালতে এবার এক, ছয়, আর চার পড়ল।

সৌতি হিসেব কষল—

১ (প্রথম ছক্কার দান) × ২ = ২, ২ + ৫ = ৭, ৭ × ৫ = ৩৫

৬ (দ্বিতায় ছক্কার দান) + ৩৫ = ৪১, ৪১ × ১০ = ৪১০

৪ (তৃতীয় ছক্কার দান) + ৪১০ = ৪১৪

চারশো চোদ্দ থেকে দু'শো পঞ্চাশ বাদ দিতেই—

৪১৪ − ২৫০ = ১৬৪।

তৃতীয় ম্যাজিক

"যে-কোন একটা সংখ্যা ঠিক করে দশ যোগ করো। তারপর দুই দিয়ে তাকে গুণ করে আজকের তারিখটা যোগ করো। হয়েছে? এবার চার দিয়ে গুণ করে কুড়ি যোগ করো। তোমার বয়সের চার গুণ তার সঙ্গে যোগ দাও। দুই দিয়ে ভাগ করে আজকের তারিখের দু'গুণ বাদ দাও। দশ বিয়োগ করো। দুই দিয়ে ভাগ করো। তোমার বয়সটা বাদ দিয়ে, দুই দিয়ে ভাগ করে, তারপর প্রথমে যে সংখ্যাটা ধরেছিল, সেটা এবার বিয়োগ করো। করেছো?"

"হ্যাঁ—"

"কত উত্তর হয়েছে বলে দেবো?"

"বলো।"

"দশ।"

"কি করে হল?"

"যে-কোন সংখ্যা দিয়েই শুরু করো না, উত্তর সব সময়েই দশ হবে। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বেশ—এবার একটা অন্য সংখ্যা ধরে দেখো—"

সৌতি বলল, "এবার নয় ধরলাম। কিন্তু রোজ তো তারিখ পাল্টাবে, বয়সও তো প্রত্যেকের বেলায় আলাদা হবে!"

"তবু উত্তর ওই দশই হবে। করেই দেখো!"

৯, ৯ + ১০ = ১৯, ১৯ × ২ = ৩৮, ৩৮ + ১২ (তারিখ) = ৫০, ৫০ × ৪ = ২০০, ২০০ + ২০ = ২২০, ২২০ + ৩২ (বয়স ৮, ৮ × ৪ = ৩২) = ২৫২, ২৫২ ÷ ২ = ১২৬, ১২৬ − ২৪ (তারিখের দু'গুণ) = ১০২, ১০২ − ১০ = ৯২, ৯২ ÷ ২ = ৪৬, ৪৬ − ৮ (বয়স) = ৩৮, ৩৮ ÷ ২ = ১৯, ১৯ − ৯ (প্রথম সংখ্যা) = ১০

চতুর্থ ম্যাজিক

বাবা বলল, "তোমার বয়সটাকে দু'গুণ করে তার সঙ্গে পাঁচ যোগ দাও। যোগফলকে পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করো। এবার একশোর কম যে-কোন একটা সংখ্যা ঠিক করো। সংখ্যাটা মনে করে রেখে আগের গুণফলের সঙ্গে যোগ দাও। এবার তিনশো পঁচাত্তর বাদ দাও। কত হল?"

সৌতি বলল, ৭৪৬

"তাহলে তোমার বয়স আট, আর একাত্তর বাদ দিয়েছিলে।"

"ঠিক বলেছ তো।"

"খুব সোজা ম্যাজিক। তুমি যে উত্তরটা বললে, তার সঙ্গে আমি একশো পঁচিশ যোগ করতেই পেয়ে গেলাম—৮৭১—যার প্রথম অঙ্কটা তোমার বয়স আর শেষ দু'টো অঙ্ক—সেই একশোর চেয়ে কম সংখ্যাটা, যা যোগ করা হয়েছে। তবে এখানে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে। কারুর বয়স যদি ন'য়ের বেশী হয়, তাহলে প্রথম দু'টো অঙ্ক হবে তার বয়স। ধরো, কারুর বয়স পনের, আর সে নয় যোগ করেছে। হিসেব করে দেখো তো, ম্যাজিক হচ্ছে কিনা?"

সৌতি লিখল—

১৫ × ২ = ৩০, ৩০ + ৫ = ৩৫, ৩৫ × ৫০ = ১৭৫০

১৭৫০ + ৯ = ১৭৫৯, ১৭৫৯ − ৩৭৫ = ১৩৮৪

১৩৮৪ + ১২৫ = ১৫০৯

বয়স পনের, আর সংখ্যাটা নয়।

পঞ্চম ম্যাজিক

"এমন একটা তিন অঙ্কের সংখ্যা বেছে নাও যার প্রথম আর তৃতীয় অঙ্ক ছ'টো আলাদা। এবার অঙ্ক তিনটেকে উল্টো করে বসিয়ে সংখ্যাটা লেখো। এই সংখ্যা ছটোর মধ্যে ছোটটাকে বড়টার থেকে বাদ দাও। যেটা উত্তর পেলে, তার শুধু প্রথম অঙ্কটা আমায় বলো।"

সৌতি বলল, "ছুই।"

"তাহলে প্রথম সংখ্যাটা ছিল ছ'শো সাতানব্বই।"

"হুঁ।"

"যে সংখ্যাই ধরো, শেষ পর্যন্ত তুমি আমায় যে অঙ্কটা বলবে, তার পরের অঙ্কটা হবে নয়। আর সর্বশেষ অঙ্কটা পাওয়া যাবে, ন'য়ের থেকে তোমার বলা অঙ্কটা বিয়োগ করে। যেমন তুমি বললে ছুই, তাই নয় থেকে ছুই বিয়োগ করে সাত পেয়েছি।"

সৌতি এবার আরেকটা সংখ্যা ধরল। তিনশো নয়। মিলিয়ে দেখতে চায়।

৩০৯-কে উল্টো করে লিখলে—৯০৩

৯০৩ − ৩০৯ = ৫৯৪

সংখ্যার প্রথম অঙ্ক = ৫

সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ক = ৯

সংখ্যার তৃতীয় অঙ্ক = ৯ − ৫ (প্রথম অঙ্ক) = ৪

ষষ্ঠ ম্যাজিক

"যে-কোন একটা সংখ্যা ঠিক করে তার শেষে একটা শূন্য জুড়ে দাও। তার সঙ্গে এবার ন'য়ের যে-কোন গুণিতক যোগ দাও। ধরো—ছ' ন'য়ে চুয়ান্ন—চুয়ান্নই যোগ দিলে না হয়। যোগফল থেকে প্রথম সংখ্যাটা বাদ দাও। যে সংখ্যাটা উত্তর হয়েছে তার থেকে শূন্য বাদে যে-কোন একটা অঙ্ক কেটে বাদ দিয়ে, বাকি সংখ্যাটা আমায় বলো।"

সৌতি সংখ্যা বাছল—৭৩৬

৭৩৬, ৭৩৬০ + ৫৪ = ৭৪১৪, ৭৪১৪ − ৭৩৬ = ৬৬৭৮

সংখ্যাটার শেষ অঙ্কটাকে বাদ দিয়ে, সৌতি বাবাকে জানাল, "ছয়, ছয়, সাত।"

বাবা বলল, "তুমি আটটাকে কেটে বাদ দিয়েছো।"

"কি করে বুঝলে ?"

"তুমি আমায় যে অঙ্কগুলো বলেছ, সেগুলো প্রথমে যোগ দিয়ে নিলাম। ছয় আর ছয়ে বারো, আর বারো আর সাতে যোগ করে পেলাম উনিশ! এবার হিসেব করলাম ন'য়ের প্রথম কোন্ গুণিতক উনিশের চেয়ে বেশি। নয় একে নয়, নয় দু'গুণে আঠার, তিন নয়ে সাতাশ—তার মানে এখানে সাতাশ হচ্ছে। এবার সাতাশের থেকে উনিশ বাদ দিতেই উত্তর পেলাম আট, যেটা তুমি বাদ দিয়েছ। আরেকটা সংখ্যা ধরে মিলিয়ে দেখো, কি হয়।"

সৌতি ঠিক করল—৮৯১২

তারপর লিখল—৮৯১২০, ৮৯১২০ + ৫৪ = ৮৯১৭৪

৮৯১৭৪ − ৮৯১২ = ৮০২৬২

৬-টাকে বাদ দিয়ে লিখল—৮০২২, ৮ + ০ + ২ + ২ = ১২

ন' দুগুণে আঠার, বারোর চেয়ে বেশি। তাই—

১৮ − ১২ = ৬

শেষ ম্যাজিক

"যে-কোন একটা সংখ্যা ধরো। এর অঙ্কগুলো যোগ করে সেই যোগফল মূল সংখ্যাটা থেকে বাদ দাও। এবার বিয়োগফলের অঙ্কগুলো যেমন খুশি ওলট পালট করে দাও। এবার তার সঙ্গে একত্রিশ যোগ করে শূন্য ছাড়া যে-কোন একটা অঙ্ক বাদ দাও। বাকি অঙ্ক ক'টার যোগফল কত হল বলো।"

সৌতি ভেবেছিল—১২৩৪৫৬

১+২+৩+৪+৫+৬=২১, ১২৩৪৫৬−২১=১২৩৪৩৫,

ওলট-পালট করে লিখেছিল—৫৩৪২১৩, ৫৩৪২১৩+৩১=৫৩৪২৪৪

দুইটাকে বাদ দিলে—৫৩৪৪৪, ৫+৩+৪+৪+৪=২০

বাবাকে উত্তরটা বললেই বাবা বলে দিল, "তুমি দুইটাকে বাদ দিয়েছো। খুব সোজা ব্যাপার। আমায় কুড়ি বলতেই, কুড়ির থেকে চার বিয়োগ করলাম। তারপর দেখলাম এই বিয়োগফলটার চেয়ে বড় অথচ নয়-এর সবচেয়ে ছোট গুণিতক কোনটা। তার মানে কুড়ি থেকে চার বাদ দিয়ে পেয়েছিলাম ষোল, আর ন' দুগুণে পাওয়া গেল আঠার, যা ষোলর চেয়ে বেশী। এবার আঠার থেকে ষোল বাদ দিতেই উত্তর বেরিয়ে পড়ল।"

নিয়মটা যাচাই করবার জন্যে সৌতি আরেকটা সংখ্যা বেছে নিল—৬৭৯

৬+৭+৯=২২, ৬৭৯−২২=৬৫৭, ৬৫৭-কে ওলট-পালট করে ৭৬৫, ৭৬৫+৩১=৭৯৬, নয়টাকে বাদ দিলে ৭৬, ৭+৬=১৩

ম্যাজিকের নিয়ম : তেরো থেকে চার বিয়োগ দিয়ে পাওয়া গেল নয়। তেরোর চেয়ে বেশী কিন্তু ন'য়ের ক্ষুদ্রতম গুণিতক—ন' দু'গুণে আঠার। এবার আঠার থেকে নয় বাদ দিতেই—নয়।



সৌতিকে অঙ্কের খেলা দেখাতে দেখাতে বাবার অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছিল। আর কিছুদিন এরকম চললে কি হত বলা যায় না। রক্ষা করল বার্ষিক পরীক্ষাটা। সৌতি পরীক্ষার ক'দিন বাবাকে আর জ্বালায়নি। আর পরীক্ষার পর—বাবা-মা'র সঙ্গে সৌতির আর কতটুকু দেখা হয়। সারাদিন তো বন্ধুদের সঙ্গেই কাটে। দেখতে দেখতে পরীক্ষার ফল বেরোবার সেই হাড়-কাঁপানো দিনটা সত্যিই এসে পড়ল। সৌতির তো বুক দুরদুর করছিল। কিন্তু নাঃ—এ যাত্রা রক্ষা—অঙ্কে মাত্র দু'টো ভুল হয়েছে। ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ি ফিরল। মায়ের নাকের কাছে রেজাল্টের কাগজটা তুলে ধরল।

বাবা-মায়ের এতদিনের পরিশ্রম তাহলে একেবারে বৃথা যায়নি।

সংখ্যার রকম সকম

অঙ্কের পরীক্ষাতে মোটামুটি ভাল করে সৌতি এখন অঙ্কটাকে পড়ার বদলে খেলা হিসেবেই দেখছে। বাবাকেও তাই সৌতির অবিরাম প্রশ্নের ধাক্কায় অঙ্কের মধ্যে মজা খুঁজে বার করতে হচ্ছে। কাজটা মোটেই শক্ত নয়, তাই সৌতিকে কোন দিনই নিরাশ হতে হয়নি। অঙ্কের খেলায় সৌতি সবচেয়ে বেশী মজা পেয়েছে সংখ্যার চাল-চলন দেখে। সংখ্যার চাল-চলনটা কি রকম ব্যাপার? এটাকে অবশ্য চাল-চলন না ব'লে রকম-সকম বলা যায়, কাণ্ড-কারখানাও বলা যায় আবার কায়দা-কানুন বা বাহারও বলা যায়। আগে ব্যাপারগুলো দেখে নাও, তারপর যেটা মনে ধরে, যেটাকে ঠিক বলে মনে করবে, সেই নামটাই দিও।

ত্রিভুজ-সংখ্যা

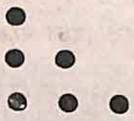
নীচের ছবিটা দেখে দশটা ক্যারামের ঘুঁটিকে ওইভাবে সাজিয়ে বসাও।



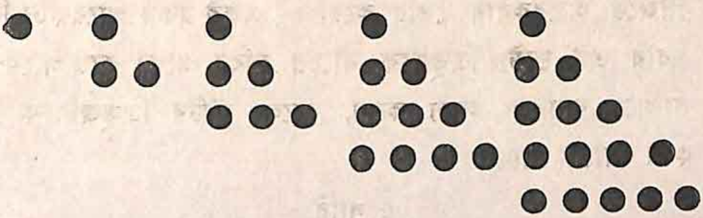
দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ঘুঁটিগুলো একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে। ত্রিভুজ মানে কি নিশ্চয় জানো। তিনটি সরল রেখা টেনে যে বন্ধ ঘরটি তৈরি করা যায়, তাকেই বলে ত্রিভুজ। এখানে দশটা ঘুঁটি এমনি একটা ত্রিভুজের আকার ধারণ করেছে।

লক্ষ্য করে দেখো, সবচেয়ে নীচের সারিতে (৪র্থ সারিতে) ঘুঁটির

সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এখানে চারটে ঘুঁটি রয়েছে। তার পরের সারিটায় (৩য় সারিতে) আছে তিনটে ঘুঁটি, মানে ৪র্থ সারির চেয়ে একটা কম। আবার দ্বিতীয় সারিতে আছে ছ'টো ঘুঁটি। এবারও আগের সারির চেয়ে ঘুঁটি একটা কমে গেছে। আর ১নং সারিতে আছে মাত্র ১টা ঘুঁটি। সেটাও দ্বিতীয় সারির থেকে ১টা ঘুঁটিকে বাদ দিয়ে পাওয়া গেছে। তার মানে প্রতি সারিতে ১টা ক'রে ঘুঁটি কমেছে। এবার একটা কাজ করো। চতুর্থ সারির চারটে ঘুঁটিকেই সরিয়ে ফেলো। তাহলে কি থাকছে ? নীচের ছবিটাতে সেইটাই দেখানো হয়েছে—



কিন্তু একটা মজা লক্ষ্য করেছ কি ? এবারেও কিন্তু ঘুঁটি ক'টা একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে। তার মানে দশটা ঘুঁটিকে পর পর সাজিয়ে যেনন ত্রিভুজ পাওয়া গেছে, এখানে তার থেকে একটা সারিকে পুরোপুরি হাটিয়ে দিয়েও ছ' ঘুঁটিওলা আরেকটা ত্রিভূজ পাওয়া গেছে। ১০ বা ৬ সংখ্যা দিয়ে এরকম ত্রিভুজ তৈরি করা যায় বলে এগুলোকে আমরা ত্রিভূজ-সংখ্যা বলতে পারি। হরেক রকমের ত্রিভুজ-সংখ্যা তৈরি করা যেতে পারে। একটা একটা করে সারি কমিয়ে সেটা যেমন পাওয়া যেতে পারে, তেমনি পাওয়া যেতে পারে একটা একটা করে সারি বাড়িয়ে। তবে সারি বাড়ানই হোক কি কমানোই হোক, পরপর যে কোন ছটো সারির মধ্যে একটায় অন্যটার চেয়ে একটা বেশী ঘুঁটি থাকবে। সবচেয়ে ছোট ত্রিভুজ-সংখ্যা হিসেবে আমরা ১-কে ধরতে ধারি। তারপর ৩। তারপর —৬। তারপর—১০। তারপর—১৫···ও পাতার ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।



এবার ছবি না এঁকে ব্যাপারটা সংখ্যায় লিখে দেখা যাক।

১—প্রথম ত্রিভুজ-সংখ্যা

১+২=৩—দ্বিতীয় ত্রিভুজ-সংখ্যা

১+২+৩=৬—তৃতীয় ত্রিভুজ-সংখ্যা

১+২+৩+৪=১০—চতুর্থ ত্রিভুজ-সংখ্যা

১+২+৩+৪+৫=১৫ পঞ্চম ত্রিভুজ-সংখ্যা

১+২+৩+৪+৫+৬=২১ ষষ্ঠ ত্রিভুজ-সংখ্যা

এটা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বিশেষ কোন ত্রিভুজ-সংখ্যা বার করতে হলে, সেই ত্রিভুজ সংখ্যা থেকে শুরু করে ১ অবধি সব কটা সংখ্যা পরপর যোগ দিতে হবে। তার মানে কেউ যদি জিগ্যেস করে, বলতো দশম ত্রিভুজ সংখ্যাটা কি? তাহলে লিখতে হবে—

১০+৯+৮+৭+৬+৫+৪+৩+২+১=৫৫

তোমরা ৫৫টা ঘুঁটি সাজিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারো, এটা ত্রিভুজ সংখ্যা হল কিনা।

এইভাবে ত্রিভুজ সংখ্যা বার করতে যে একটা ঝামেলা হচ্ছে সেটা নিশ্চয় বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। কেউ যদি জানতে চায় ১৮-তম ত্রিভুজ সংখ্যাটা কত, তাহলে কত যোগ দিতে হবে বলতো? বাপ্‌রে!

না—না—ঘাবড়াবার কিছু নেই। একটা খুব সোজা নিয়ম আছে ত্রিভুজ সংখ্যা বার করবার। চতুর্থ ত্রিভুজ সংখ্যাটার কথাই ধরা যাক্। দশটা সাদা ক্যারমের ঘুঁটি সাজিয়ে ত্রিভুজটা আগে তৈরি করে নাও। এবার আরো দশটা কালো ক্যারামের ঘুঁটিকে ঠিক একইভাবে

সাজিয়ে আরেকবার তৈরি করো ওই একই রকম আরেকটা ত্রিভুজ এবার এই দুটো ত্রিভুজকে নীচের ছবির মতো করে গায়ে-গায়ে লাগিয়ে বসাও। লক্ষ্য করো, কালো ঘুঁটির ত্রিভুজটাকে উল্টো করে বসানো হয়েছে।

৫ সারি

	০ ● ● ● ●
৪ সারি	০ ০ ● ● ●
	০ ০ ০ ● ●
	০ ০ ০ ০ ●

কালো ঘুঁটি আর সাদা ঘুঁটিগুলো গুনলে দেখা যাবে দুটো ত্রিভুজ মিলিয়ে কুড়িটা লেগেছে। এবার লক্ষ্য করো এখানে পাশাপাশি সারির সংখ্যা ৫ আর ওপর থেকে নিচে সারির সংখ্যা ৪। পাঁচকে চার দিয়ে গুণ করলে দেখবে, ঘুঁটির সংখ্যার সমষ্টি পাওয়া যাচ্ছে।

এখন কুড়িটা যেহেতু দুটো ত্রিভুজ সংখ্যার সমষ্টি, একে ২ দিয়ে ভাগ করলেই আসল ত্রিভুজ সংখ্যাটা বেরিয়ে পড়বে। অর্থাৎ—

সারির সংখ্যা ৪ × সারির সংখ্যা ৫ = ১০

২০ ÷ ২ = ১০, ত্রিভুজ সংখ্যা।

এখানে আরো লক্ষ্য করার ব্যাপার আছে। যেহেতু ত্রিভুজ সংখ্যাটি ৪, তাই একটা সারির ঘুঁটির সংখ্যা ৪, আর অন্য সারির ঘুঁটির সংখ্যা তার সঙ্গে ১ যোগ করে—৫। এই নিয়মে যে-কোন ত্রিভুজ সংখ্যা বার করা খুবই সোজা। ধরা যাক ত্রিভুজ সংখ্যা ৯-এর মান বার করতে হবে।

ত্রিভুজ সংখ্যা—৯

অতএব একটা সারিতে থাকবে—৯

আর দ্বিতীয় সারিতে থাকবে—৯ + ১ = ১০

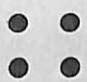
অতএব, ত্রিভুজ সংখ্যা ৯-এর দ্বিগুণ—৯ × ১০ = ৯০

ত্রিভুজ সংখ্যা-৯—৯০ ÷ ২ = ৪৫

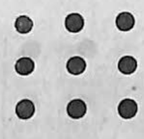
তোমরা এবার ঘুঁটি সাজিয়ে মিলিয়ে গ্যাখো।তো ৪৫-টা ঘুঁটি দিয়ে ত্রিভুজ তৈরি করা যাচ্ছে কিনা। তারপর নিজেরা চেষ্টা করে গ্যাখো, ৩৯তম ত্রিভুজ-সংখ্যা আর ৭৯তম ত্রিভুজ সংখ্যাটা বার করতে পারো কিনা।

চতুর্ভুজ সংখ্যা

ত্রিভুজ সংখ্যাগুলোর মতো এমন কতকগুলো সংখ্যা আছে যা চতুর্ভুজের আকারে সাজানো যায়। জানো নিশ্চয়—চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের চারটে পাশই আকারে সমান। চতুর্ভুজ সংখ্যা বার করা খুব সোজা। যে-কোন সংখ্যাকে সেই একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলেই চতুর্ভুজ সংখ্যা বেরিয়ে পড়ে। যেমন ২-কে ২ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় ৪, ৩-কে ৩ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় ৯। ৪ ও ৯ এই দুটোই চতুর্ভুজ সংখ্যা।



২ × ২ = ৪



৩ × ৩ = ৯

সবচেয়ে ছোট চতুর্ভুজ সংখ্যা হচ্ছে ১, কারণ ১ × ১ = ১

২-কে ২ দিয়ে বা ৩-কে ৩ দিয়ে গুণ করলে অঙ্কের ভাষায় সেটাকে ২ × ২ বা ৩ × ৩ না লিখে $২^২$ বা $৩^২$ও লেখা যেতে পারে। যাকে আমরা ২-এর বর্গ বা ৩-এর বর্গও বলতে পারি। অর্থাৎ—

$২ \times ২ = ২^২$ = দু’-এর বর্গ = ৪

ঠিক তেমনি, $৫ \times ৫ = ৫^২$ = পাঁচ-এর বর্গ = ২৫। ২-এর বর্গ বলতে আমরা যেমন ৪ বুঝি, তেমনি ৪-এর বর্গমূল বলতে আমরা বুঝি ২। বর্গমূলটা $\sqrt{\ }$ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। যেমন,

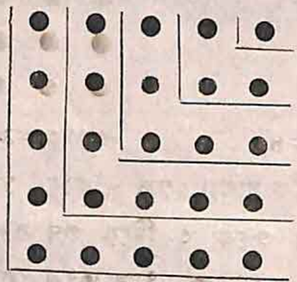
৪-এর বর্গমূল = $\sqrt{৪}$ = ২

এবার চতুর্ভুজ সংখ্যার কতকগুলো মজার চাল-চলন লক্ষ্য করা যাক। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, জোড় আর বিজোড় সংখ্যা কাকে

বলে। যে সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না তাকে বলে জোড় সংখ্যা, আর যে সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ১, তাকে বলে বিজোড় সংখ্যা। তার মানে ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি বিজোড় সংখ্যা। এবার ছাখো, নীচে বিজোড় সংখ্যাগুলোকে একে একে যোগ দিয়ে কি কাণ্ড হয়েছে।

$$১ = ১ = ১^২ \text{—১ম চতুর্ভুজ সংখ্যা}$$
$$১ + ৩ = ৪ = ২^২ \text{—২য় ” ”}$$
$$১ + ৩ + ৫ = ৯ = ৩^২ \text{—৩য় ” ”}$$
$$১ + ৩ + ৫ + ৭ = ১৬ = ৪^২ \text{—৪র্থ ” ”}$$
$$১ + ৩ + ৫ + ৭ + ৯ = ২৫ = ৫^২ \text{—৫ম ” ”}$$

অবাক হয়েছ তো? কেন এরকম হল বুঝতে পেরেছ কি? তাহলে নিচের ছবিটা ছাখো।



লক্ষ্য করো, একটা চতুভুজ সংখ্যা থেকে তার পরের চতুভুজ সংখ্যাটায় পৌঁছানোর জন্যে আমরা শুধু L এর আকারে ঘুঁটির সারি যোগ করে যাচ্ছি। এই যোগ-করা ঘুঁটির সংখ্যাগুলো সব সময়েই বিজোড়। আর সেইজন্যেই ১ থেকে শুরু করে বিজোড় সংখ্যাগুলোকে সারি দিয়ে পর পর যোগ করলেই চতুর্ভুজ সংখ্যা পাওয়া যায়।

চতুর্ভুজ সংখ্যার আরেকটা মজার গুণ আছে। সেটা হল ত্রিভুজ সংখ্যার সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক। পর পর যে-কোন ছুটো

ত্রিভুজ সংখ্যা যোগ দিলে সেটা একটা চতুর্ভুজ সংখ্যা হয়ে যায়। যেমন ছাখো—

১ম ত্রিভুজ সংখ্যা + ২য় ত্রিভুজ সংখ্যা = ১ + ৩ = ৪ = $২^২$

কিংবা, ৪র্থ ত্রিভুজ সংখ্যা + ৫ম ত্রিভুজ সংখ্যা = ১০ + ১৫ = ২৫ = $৫^২$

মজার ব্যাপার না? কেন এরকম হয় তার কারণ খুঁজে বার করা শক্ত নয়। যে-কোন চতুর্ভুজ সংখ্যাকেই নিচের ছবিটার মতো দু'টো ত্রিভুজ সংখ্যায় ভেঙে ফেলা যায় বলেই এরকম হয়।

```
                                               ●  ●  ●
0  ●  ●  ●  0                                     ●  ●
0  0  ●  ●  0  0                                     ●
0  0  0  ● = 0  0  0  +
0  0  0  0  0  0  0  0
   ১৬ =           ১০     +                      ৬
```

৪র্থ চতুর্ভুজ সংখ্যা = $৪^২$ = ৫ম ত্রিভুজ সংখ্যা + ৪র্থ ত্রিভুজ সংখ্যা

চতুর্ভুজ সংখ্যার সঙ্গে ত্রিভুজ সংখ্যার আরো একটা যোগাযোগ আছে। সেটাও বেশ মজার। যে-কোন ত্রিভুজ সংখ্যাকে ৮ গুণ করে তার সঙ্গে ১ যোগ দিলেই একটা চতুর্ভুজ সংখ্যা পাওয়া যাবে।

৩য় ত্রিভুজ-সংখ্যা ৬ আর ৫ম ত্রিভুজ-সংখ্যা ১৫-কে ধরা যাক—

৬ × ৮ = ৪৮, ৪৮ + ১ = ৪৯ = $৭^২$

১৫ × ৮ = ১২০, ১২০ + ১ = ১২১ = $১১^২$

কি, ঠিক বলেছি তো? তোমরা এবার নিজেরা কয়েকটা ত্রিভুজ সংখ্যা ধরে আবার মিলিয়ে ছাখো।

ঘন-সংখ্যার রীতি-নীতি

চতুর্ভুজ সংখ্যা বা সংখ্যার বর্গ বার করার বেলায় একটা সংখ্যাকে সেই একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয়। ঘন সংখ্যা বার করার সময় একটা সংখ্যাকে সেই একই সংখ্যা দিয়ে পর পর দু'বার গুণ দিতে হয়। যেমন, ২-এর ঘন = ২ × ২ × ২ = ৮

'২-এর বর্গ' না লিখে আমরা যেমন '২²' লিখতে পারি, তেমনি '২-এর ঘন' না-লিখে আমরা লিখতে পারি—'২³'।

এবার পর পর কয়েকটা ঘন সংখ্যা লেখা যাক—

১ম ঘন সংখ্যা $= ১^৩ = ১$
২য় „ „ $= ২^৩ = ৮$
৩য় „ „ $= ৩^৩ = ২৭$
৪র্থ „ „ $= ৪^৩ = ৬৪$ ইত্যাদি

ঘন সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনো মজার লক্ষণ চোখে পড়ছে কি? পড়ছে না? আচ্ছা ঠিক আছে, এবার পর পর ১৯ অবধি সবকটা বিজোড় সংখ্যা লিখে যাও—

১

$\left.\begin{matrix}৩\\৫\end{matrix}\right\} ৩+৫=৮$

$\left.\begin{matrix}৭\\৯\\১১\end{matrix}\right\} ৭+৯+১১=২৭$

$\left.\begin{matrix}১৩\\১৫\\১৭\\১৯\end{matrix}\right\} ১৩+১৫+১৭+১৯=৬৪$

লক্ষ্য করে ছাখো, প্রথম বিজোড় সংখ্যাটা একটা ঘন সংখ্যা। এবার দ্বিতীয় আর তৃতীয় বিজোড় সংখ্যাটা যোগ করো, তারপর ৪র্থ, ৫ম আর ৬ষ্ঠ বিজোড় সংখ্যা কটা যোগ করো, তারপর যোগ করো ৭ম, ৮ম, ৯ম আর ১০ম-টা। কি দেখছো—

১	৩+৫	৭+৯+১১	১৩+১৫+১৭+১৯
↓	↓	↓	↓
$১=১^৩$	$৮=২^৩$	$২৭=৩^৩$	$৬৪=৪^৩$

ঘন-সংখ্যাগুলো বেরিয়ে পড়েছে না? আরো বিজোড় সংখ্যা নিয়ে এইভাবে পর পর যোগ করে ছাখো, প্রত্যেকবারই ঘন-সংখ্যাই পাবে।

এবার বলি ঘন-সংখ্যার সঙ্গে ত্রিভুজ সংখ্যার যোগাযোগের কথা। পর পর কয়েকটি ঘন-সংখ্যাকে যোগ করলে যে যোগফল হবে, তা সব সময়েই একটি ত্রিভুজ সংখ্যার বর্গ। এই ছাখো—

$১^৩ = ১ = ১^২$, ১ = ১ম ত্রিভুজ সংখ্যা

$১^৩ + ২^৩ = ৯ = ৩^২$, ৩ = ২য় ত্রিভুজ সংখ্যা

$১^৩ + ২^৩ + ৩^৩ = ৩৬ = ৬^২$, ৬ = ৩য় ত্রিভুজ সংখ্যা

$১^৩ + ২^৩ + ৩^৩ + ৪^৩ = ১০০ = ১০^২$, ১০ = ৪র্থ ত্রিভুজ সংখ্যা

$১^৩ + ২^৩ + ৩^৩ + ৪^৩ + ৫^৩ = ২২৫ = ১৫^২$, ১৫ = ৫ম ত্রিভুজ সংখ্যা

এই নিয়মটা জানা থাকলে সময়ে সময়ে কতো সুবিধে হতে পারে জানো? ধরো, এই রকম একটা অঙ্ক এল পরীক্ষায়—

$১^৩ + ২^৩ + ৩^৩ + ৪^৩ + ৫^৩ + ৬^৩ + ৭^৩ = ?$

কতো গুণ আর যোগ করলে তবে উত্তর বেরোবে। কিন্তু তুমি তো জানো পরপর ঘন-সংখ্যা যোগ করলে তার যোগফল সর্বদাই ত্রিভুজ সংখ্যার বর্গ হয়। কাজেই ওপরের অঙ্কটাকে দেখেই তুমি প্রথমে ৭-ম ত্রিভুজ সংখ্যাটা বার করে নেবে। (সবচেয়ে শেষে $৭^৩$ আছে দেখে।)

৭-ম ত্রিভুজ সংখ্যা $= ৭ \times ৮ \div ২$

$= ৫৬ \div ২ = ২৮$

এবার ২৮-এর বর্গ বার করলেই বড় অঙ্কটার উত্তর বেরিয়ে পড়বে।

$২৮^২ = ৭৮৪$

এইভাবে খুব সহজে নিচের অঙ্কটা কষে ফ্যালোতো দেখি।

$১^৩ + ২^৩ + ৩^৩ + ৪^৩ + ৫^৩ + ৬^৩ + ৭^৩ + ৮^৩ + ৯^৩ + ১০^৩ = ?$

নিখুঁত সংখ্যা

বাবা সৌতিকে বলল, 'বুঝলে, ৬ সংখ্যাটাকে আমার ভারী পছন্দ। এটা একটা নিখুঁত সংখ্যা।'

সৌতি অবাক হল, 'নিখুঁত সংখ্যা! তার মানে?'

'বলছি, বলছি। ৬-এর চেয়ে ছোট কোন্ কোন্ সংখ্যা দিয়ে ৬-কে ভাগ করা যায় বলতো?'

'১, ২ আর ৩ দিয়ে।'

'ঠিক হয়েছে। এবার ১, ২ আর ৩ যোগ করো তো।'

সৌতি যোগ দিল—১+২+৩=৬

'দেখেছো—নিখুঁত সংখ্যা বলেই ভাজকগুলো যোগ দিতেই আবার আগের সংখ্যাটাই ফেরত এসে গেছে।'

'সত্যি, ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার। যে-কোন সংখ্যার বেলায় কি এরকম হবে?' সৌতি জানতে চাইল।

'নিজেই হিসেব করে দ্যাখো। ১২-টাকেই পরীক্ষা করো না হয়।'

সৌত লিখল, ১২-কে ভাগ করা যায় অথচ ১২-এর চেয়ে ছোট এরকম সংখ্যা হচ্ছে—১, ২, ৩, ৪ আর ৬। 'এবার ভাজকগুলো যোগ করে দেখি কি হয়।' সৌতি লিখল—

১+২+৩+৪+৬=১৬

'কি হল? নিখুঁত সংখ্যা হল না তো?' বাবা হাসে।

'এবার আরেকটা সংখ্যা পরীক্ষা করে দেখি।' সৌতি নিখুঁত সংখ্যা বার করবেই করবে।

৮ সংখ্যাটাকে বেছে নিল সৌতি।

৮-এর ভাজক—১, ২ ও ৪

ভাজকের সমষ্টি—১+২+৪=৭

এবারেও হল না।

বাবাকে হাসতে দেখে সৌতির ভারী রাগ হয়। ৬ ছাড়া আর কোন নিখুঁত সংখ্যা বোধহয় হয়ই না। বাবা শুধু শুধু খাটাচ্ছে।

বাবা বললে, 'কে বলেছে হয় না। ৬-এর মতো, ২৮ ও একটা নিখুঁত সংখ্যা।'

সঙ্গে সঙ্গে সৌতি লিখে ফেলল—

২৮ এর ভাজক—১, ২, ৪, ৭ ও ১৪

ভাজকের সমষ্টি—১ + ২ + ৪ + ৭ + ১৪ = ২৮

সৌতি জিজ্ঞেস করল, '৬ আর ২৮ ছাড়া আর কি কি নিখুঁত সংখ্যা আছে বাবা ?'

'৬, ২৮, ৪৯৬ ও ৮১২৮—এই চারটেই নিখুঁত সংখ্যা। কিন্তু পঞ্চম নিখুঁত সংখ্যাটা হিসেব করে বার করতে কতদিন লেগেছিল জানো ? প্রাচীন গ্রীস দেশের অঙ্কের পণ্ডিতরা তো হার মেনেই ছিলেন, তার পরেও ১৪০০ বছর পার করে তবে আবিষ্কার হয়েছিল সেই সংখ্যাটা। সংখ্যাটা হচ্ছে—৩৩, ৫৫৭, ৩৩৬। ষষ্ঠ নিখুঁত সংখ্যাটা হচ্ছে—৮, ৫৮৯, ৮৬০, ৭৫৬। ১৯৬৫ সাল অবধি মাত্র তেইশটা নিখুঁত সংখ্যা বেরিয়েছে। তেইশ নম্বর নিখুঁত সংখ্যাটা লিখতে ৬৭৫১টা অঙ্ক লাগে। বুঝলে ?'

'ওরে বাবা !'

'তুমি বরং প্রমাণ করার চেষ্টা করো যে ৪৯৬ একটা নিখুঁত সংখ্যা।'

[৪৯৬-এর ভাজক = ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩১, ৬২, ১২৪, ২৪৮
ভাজকের সমষ্টি = ১ + ২ + ৪ + ৮ + ১৬ + ৩১ + ৬২ + ১২৪ + ২৪৮ = ৪৯৬]

মৌলিক আর যৌগিক সংখ্যা

যে সংখ্যাকে মাত্র দুটো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তাকে বলে মৌলিক সংখ্যা। এই দুটো সংখ্যার মধ্যে একটা সব সময়েই—১, আর অন্যটা সেই সংখ্যাটা স্বয়ং। যেমন ২-কে, ১ ও ২ দিয়েই শুধু ভাগ করা যায়। ৫-কে, ১ ও ৫ দিয়েই শুধু ভাগ করা যায়। কিন্তু ৪ কে, ১ ও ৪ ছাড়াও ২ দিয়েও ভাগ করা যায়, তাই ৪ কে আমরা বলবো যৌগিক সংখ্যা। ১ কে মৌলিকও বলা হয় না যৌগিকও

নয়। মৌলিক সংখ্যাকে গুণ করে যে-কোন যৌগিক সংখ্যা পাওয়া যায় কিন্তু মৌলিক সংখ্যা তৈরি করার কোন ফর্মূলা বা সমীকরণ আজ অবধি আবিষ্কার হয়নি। মৌলিক সংখ্যাগুলির মধ্যে আজ অবধি কোনো শৃঙ্খলা বা নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে বিশেষ দু'টি সংখ্যার মধ্যে কমপক্ষে কটি মৌলিক সংখ্যা থাকবে তা বলে দেওয়া যায়। মৌলিক সংখ্যা বার করার এমনি একটা উপায় নিচে লিখে দেওয়া হল। ধরো ২ থেকে ৩০ অবধি সংখ্যা কটার মধ্যে থেকে মৌলিক সংখ্যাগুলো বার করতে হবে। প্রথমেই সংখ্যাগুলোকে পরপর লিখে নাও—

২, ৩, ~~৪~~, ৫, ~~৬~~, ৭, ~~৮~~, ~~৯~~, ~~১০~~
১১, ~~১২~~, ১৩, ~~১৪~~, ~~১৫~~ ~~১৬~~, ১৭, ~~১৮~~, ১৯, ~~২০~~
~~২১~~, ~~২২~~, ২৩, ~~২৪~~, ~~২৫~~, ~~২৬~~ ~~২৭~~, ~~২৮~~, ২৯ ও ~~৩০~~

এখানে প্রথম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে ২। ২-এর তলায় একটা দাগ দাও। এবার ২-এর গুণিতক যে যে সংখ্যা আছে সেগুলোকে কেটে বাদ দিয়ে দাও। যে-সংখ্যাগুলো পড়ে রইল তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে ৩। ৩ এর তলায় আবার দাগ দাও। এবার ৩-এর গুণিতক গুলোকেও (৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ২৭ ও ৩০) আগের মতো কেটে বাদ দিয়ে দাও। এইভাবে একটা একটা করে মৌলিক সংখ্যা ধরো, তার তলায় দাগ দাও আর তার গুণিতকগুলো কেটে বাদ দাও। শেষ পর্যন্ত যে সংখ্যা কটা পড়ে থাকবে সেগুলোই হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা। তার মানে ২ থেকে ৩০-এর মধ্যে এই রকম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে—২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩ ও ২৯।

এ অবধি কম্পিউটারের সাহায্যে সবচেয়ে বড় যে মৌলিক সংখ্যাটি বার করা গেছে (১৯৭১ সালে) সেটি হল—

$$২^{১৯,৯৩৭} - ১$$

এই সংখ্যাটির অঙ্ক সংখ্যা—৬০০২টি!

ঘুরঘুরে সংখ্যা আর মৌলিক সংখ্যা

১৪২৮৫৭-কে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ দিয়ে পরপর গুণ করে নীচে লেখা হয়েছে ছাখো—

১৪২৮৫৭ × ১ = ১৪২৮৫৭

১৪২৮৫৭ × ২ = ২৮৫৭১৪

১৪২৮৫৭ × ৩ = ৪২৮৫৭১

১৪২৮৫৭ × ৪ = ৫৭১৪২৮

১৪২৮৫৭ × ৫ = ৭১৪২৮৫

১৪২৮৫৭ × ৬ = ৮৫৭১৪২

গুণফলের মধ্যে একটা মজার জিনিষ লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়। প্রত্যেকটা গুণফলেই ১, ৪, ২, ৮, ৫ ও ৭—এই ছটা অঙ্কই ঘুরে ফিরে বসেছে।

এই ধরনের সংখ্যাকে আমরা ঘুরঘুরে সংখ্যা বলতে পারি, তাই না? এবার বলি কিভাবে ঘুরঘুরে সংখ্যা পাওয়া যায়।

৭ দিয়ে ১-কে ভাগ করো তো দেখি—

```
৭) ১·০০০০০ ··· ( ·১৪২৮৫৭১৪···
    ৭
   ---
    ৩০
    ২৮
   ---
     ২০
     ১৪
    ---
      ৬০
      ৫৬
     ---
       ৪০
       ৩৫
      ---
        ৫০
        ৪৯
       ---
         ১০
          ৭
        ---
         ৩০
         ২৮
        ---
          ২০
          ···
```

দেখছো তো, ভাগফলে ১৪২৮৫৭ সংখ্যাটা ঘুরে ঘুরে আসছে।

এবার ১৭ দিয়ে ১-কে ভাগ করো। দেখবে, ভাগফল হচ্ছে—০৫৮৮ ২৩৫ ২৯৪ ১১৭ ৬৪৭··আরো ভাগ করো যদি, আগের মতোই এই সংখ্যাটাই আবার ঘুরে আসবে। এই ভাগফলটাকে ১ থেকে ১৬ অবধি যে-কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে দেখা যাবে এটাও একটা ঘুরঘুরে সংখ্যা। গুণফলে এই কটা অঙ্কই শুধু ঘুরে ফিরে বসছে।

তাহলে দেখা গেল, ৭ বা ১৭ দিয়ে ১-কে ভাগ করে ঘুরঘুরে সংখ্যা পাওয়া গেছে। লক্ষ্য করো, ৭ ও ১৭ দুটোই মৌলিক সংখ্যা। তা বলে যে-কোন মৌলিক সংখ্যা দিয়ে ১-কে ভাগ করলেই কিন্তু ঘুরঘুরে সংখ্যা পাওয়া যাবে না। ১-থেকে ১০০-র মধ্যে এই ক'টা মৌলিক সংখ্যা থেকে ঘুরঘুরে সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে—

৭, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯, ৪৭, ৫৯, ৬১ ও ৯৭

নয় এর বন্যা

এবার ঘুরঘুরে সংখ্যার ক'টা মজা ভ্যাখো। প্রথম ঘুরঘুরে সংখ্যা ১৪২৮৫৭-কে তার সৃষ্টিকারী মৌলিক সংখ্যা ৭ দিয়ে গুণ করো—

১৪২৮৫৭ × ৭ = ৯৯৯৯৯৯

এবার দ্বিতীয় ঘুরঘুরে সংখ্যাকে তার সৃষ্টিকারী মৌলিক সংখ্যা ১৭ দিয়ে গুণ করো—

৫৮৮২৩৫২৯৪১১৭৬৪৭ × ১৭ = ৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

নয়-এর বন্যা বয়ে গেছে একেবারে, তাই না ?

যে কোন ঘুরঘুরে সংখ্যাকে তার সৃষ্টিকারী মৌলিক সংখ্যা দিয়ে গুণ করলেই এইরকম ৯-র বন্যা বইবে। ঘুরঘুরে সংখ্যা থেকে ৯-এর বন্যা বওয়ানোর আরো একটা উপায় আছে।

যে কোন ঘুরঘুরে সংখ্যার ঠিক মাঝখানে একটা দাঁড়ি টেনে

সেটাকে দুটো টুকরো ক'রে তারপর টুকরো দুটো যোগ দাও। যেমন ধরো—

১৪২ | ৮৫৭

এখানে সংখ্যাটার ঠিক মাঝখানে একটা লাইন টেনে এটাকে দু'টুকরো করা হয়েছে। এবার টুকরো দুটোকে যোগ দিলেই—

১৪২
৮৫৭
―――
৯৯৯

এবার দ্বিতীয় ঘুরঘুরে সংখ্যাটাকে নিয়ে টুকরো করো—

০৫৮৮২৩৫২ | ৯৪১১৭৬৪৭

টুকরো দুটো যোগ করলে—

০৫৮৮২৩৫২
৯৪১১৭৬৪৭
―――――――
৯৯৯৯৯৯৯৯

এবারো নয়-এর বন্যা। যে-কোন ঘুরঘুরে সংখ্যার বেলায় এই রকম হবে। বিরাট একটা ভাগ করার ধৈর্য থাকে যদি তাহলে করে দেখতে পারো। ১৯ দিয়ে ১-কে ভাগ করে আগে ঘুরঘুরে সংখ্যাটা বার করে নাও, তারপর নয়-এর বন্যা বওয়াবার চেষ্টা করো।

ঘুরঘুরে সংখ্যা তৈরি করার আরেক নিয়ম

	১৪
১৪ × ২	···২৮
২৮ × ২	··· ···৫৬
৫৬ × ২	··· ···১১২
১১২ × ২	··· ···২২৪
২২৪ × ২	··· ···৪৪৮
	১৪২৮৫৭১৪২৮···

এখানে ১৪ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে দুই দিয়ে গুণ করা হয়েছে। তারপর প্রত্যেকটা গুণফল দু'ঘর করে ডান দিকে সরিয়ে একটার তলায় আরেকটা বসানো হয়েছে। তারপর সংখ্যাগুলোকে বাঁ দিক থেকে যোগ দিতেই বেরিয়ে পড়েছে ঘুরঘুরে সংখ্যাটা—১৪২৮৫৭।

৭ থেকে শুরু করে, প্রতিবার ৫ দিয়ে গুণ করে ও বাঁ দিকে একঘর করে সরিয়ে সংখ্যাগুলোকে যদি তলায় তলায় লেখা যায়, তাহলেও দেখা যাবে, যোগ দিলেই ওই ঘুরঘুরে সংখ্যাটা বেরিয়ে পড়ছে—

৭	
৩৫	… …=৭ × ৫
১৭৫	… …=৩৫ × ৫
৮৭৫	… …=১৭৫ × ৫
৪৩৭৫	… …=৮৭৫ × ৫
২১৮৭৫	… …=৪৩৭৫ × ৫
… …	
… …	
…১৪২৮৫৭	

ঠিক এই ভাবেই মৌলিক সংখ্যা ১৯ থেকে ঘুরেঘুরে সংখ্যাটা (১৮টা অঙ্ক বিশিষ্ট) বার করা সম্ভব। এখানে ১ থেকে শুরু করতে হবে, প্রতি ধাপে ২ দিয়ে গুণ করে যেতে হবে ও এক ঘর করে বাঁ দিকে সরিয়ে সরিয়ে বসিয়ে তারপর যোগ দিতে হবে।